দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা || ২৫ আগস্ট - ২০১৪ || ৮ ভাদ্র - ১৪২১ || website : www.eswastika.com

অমিত শাহ

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, ৮ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৫ আগস্ট - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

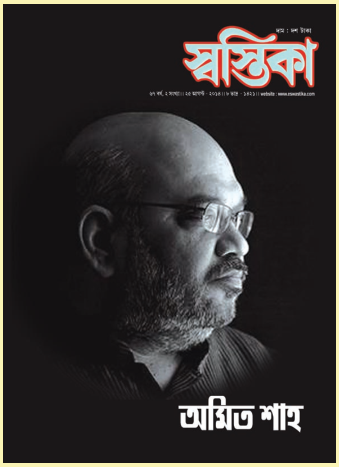

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : লালকেল্লায় লাল পাগড়ি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

কোমর বেঁধে নামলে চৌরঙ্গী ও বসিরহাট দুটি উপনির্বাচনেই জিতবে বিজেপি ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

রাজনীতিতে কর্পোরেট সংস্কৃতি ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১১

বিজেপি-র সভাপতি পদে অভিষিক্ত অমিত শাহ ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৩

সাক্ষাৎকার : একটা অমিত শাহ গেলে মোদীর কোনো যায় আসে না ▯ ১৬

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ— অমিত শাহ ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ১৮

গণেশ— তত্ত্বে ও তথ্যে ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২১

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন— বামনাবতার ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ২২

নির্বাচনী যুদ্ধের পরাজয়েই শেষ নয়, কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করছে আরও বড় যুদ্ধ ▯ সুহাস পালশিকর ▯ ২৭

লালু-নীতিশের যুগ্ম-সভা মাঠে মারা গেল ▯ ২৯

ভবানীপুর-কালীঘাটের দূরত্ব কতটা? ▯ শ্যামল কুমার হাতি ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫-৩৬** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১ সেপ্টেম্বর
২০১৪

প্রকাশিত হবে
১ সেপ্টেম্বর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় কৃষিতে জৈবিক সার

ভারতের আশি শতাংশ মানুষই কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক। দেশের সওয়াশো কোটি মানুষের দু'বেলা আহার যোগানোর জন্য যে সবুজ বিপ্লব ঘটানো হলো, তার পরিণাম কিন্তু ততো ভালো হলো না। অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে গেছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং ভারাক্রান্ত কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এই পটভূমিতেই প্রশ্ন উঠেছে ভারতীয় কৃষির উন্নয়নে আবার কি জৈবিক সারের উপর জোর দিতে হবে? এই নিয়েই এবারে আলোচনা করেছেন নগেন্দ্রনাথ বর্মন, ড. রঘুবংশমণি পাণ্ডে, অজিত বারিক প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এক নূতন পথনির্দেশ

গত কয়েক দশক ধরিয়া স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীরা ভারতের ‘মাহাত্ম্য’ লইয়া আমাদের ভুল বুঝাইয়াছেন। গত ১৫ আগস্ট এই প্রথমবার, একজন প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে আমরা শুনিলাম যে যদিও ভারত মহান দেশ হইবার ক্ষমতা রাখে, তবুও সেখানে এখনও আমরা পৌঁছাইতে পারি নাই। এজন্য এখনও আমাদের অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। ‘গরিব দেশ’ এই অজুহাত দিয়া আমরা আমাদের অযোগ্যতা ঢাকিতে পছন্দ করি। তাহা হইলে কীভাবে আমাদের দেশ মহান হইবে আশা করতে পারি? শ্রী মোদী এই কটু সত্যটি স্মরণ করাইয়া দিয়া ‘আমাদের ভারত মহান’ করিবার জন্য দেশবাসীকে নিজেদের কর্তব্য পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

যেসব কথা শুনিতে আমরা অপছন্দ করি, সেইগুলি তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যেমন, আমরা আমাদের মহিলাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করি, আমাদের শহরগুলি কেমন রুগ্ন ও নোংরা, সুশাসনের অভাবে অন্য দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা কেমন অসমর্থ এবং স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও দারিদ্র্য দূরীকরণে আমরা কেমন লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ। ইতিপূর্বে আর কোনো প্রধানমন্ত্রী এইভাবে আমাদের নাড়া দেন নাই। এই প্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি ভারতবাসীকে বলিলেন যে ভারতের জন্য তাহারা কি করিতে পারে এবং ভারতের জন্য তাহাদের যাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এই প্রথম কোনো জাতীয় নেতা যিনি বলিলেন না, তিনি আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দিবেন এবং আমাদের একটু অপেক্ষা করিতে হইবে মাত্র। পরিবর্তে তিনি উৎপাদনমুখী এক নূতন ভারত নির্মাণের কথা বলিলেন। যোজনা কমিশনের অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করিলেন। নেহরুবাদী সমাজতন্ত্রের ইতি টানিলেন। মোদী এমন এক ভারত গঠনের কথা বলিলেন যেখানে দারিদ্র্যকে মহান হিসেবে প্রদর্শন করা হইবে না বরং ধ্বংস করা হইবে এবং পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিত হইবে। এই কারণেই তিনি সার্ক-গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলিয়াছেন।

নেহরুবাদী সমাজতন্ত্র সাধারণ ভারতবাসীর মানসিকতায় এমন একটি বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল যে সরকারকেই তাহার জন্য সব করিয়া দিতে হইবে। এই মানসিকতার একটি উদাহরণ হইল, বিশেষত শহরে, লোকে নোংরা পরিবেশের মধ্যে বসবাস করিতে অসহ্যবোধ করিলেও তাহা পরিষ্কারের জন্য কেউ একটি আঙুল নাড়াইতেও আগাইয়া আসে না। আমাদের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা সেবকের পরিবর্তে প্রভু হিসাবেই নিজেদের প্রতিপন্ন করিতে চান। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে প্রধান সেবক হিসাবে পরিচয় দিয়া সেবার প্রকৃত অর্থটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যাহা এযাবৎ এইসব ব্যক্তিদের কাছে ছিল অর্থহীন। একইসঙ্গে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যাঁহারা নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিয়া যায়। তাঁহারা এখন নিজেদের নির্বাচন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাকা কাজে লাগাইতে বাধ্য হইবেন। স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ প্রকৃতপক্ষে একটি দিক পরিবর্তনের নির্দেশ দেয় যেখানে সাধারণ মানুষ আরও সক্রিয়ভাবে উন্নয়ন ও জাতি গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ইহার পরিধি যতই বিস্তৃত হইবে ততই জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসকরা অনুভব করিবেন, তাঁহারা জনতার প্রভু নন, সেবক।

সুভাষিত

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।।

যিনি অপরের স্ত্রীকে মায়ের মতো, অপরের জিনিসকে মাটির ঢেলার মতো এবং সকল প্রাণীকে নিজের মতো দেখে থাকেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।

সংবাদ প্রতিবেদন

লালকেল্লা থেকে 'উন্নত ভারত, মজবুত ভারত' গড়ার ডাক দিলেন মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৫ আগস্ট দেশের ৬৮তম স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভারতের ত্রয়োদশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাষণ দিলেন, তাতে এক নতুন যুগের সুচনা হলো। তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দিলেন যাঁর জন্ম স্বাধীনতার পর। ভাষণের শুরুতেই তিনি নিজেকে 'প্রধানমন্ত্রী নই, প্রধান সেবক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষণের অন্যতম বিষয়--- যোজনা কমিশনের অবলুপ্তির ঘোষণা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''কখনও কখনও পুরানো বাড়ি মেরামতে খরচ বেশি পড়ে, অথচ আমরা তাতে সন্তুষ্টও হই না। তাই আমাদের মনে হয়, সবাই মিলে একটা নতুন বাড়ি তৈরি করলেই ভাল।'' তাঁর এই ঘোষণাকে নব্বইয়ের দশকে লাইসেন্স রাজ অবসানের পরে সবচেয়ে বড় সংস্কার হিসেবে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন। এভাবেই 'উন্নত ভারত, মজবুত ভারত' গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এক ঘণ্টার বেশি বক্তৃতার প্রায় গোড়ার দিকেই তিনি নিজেকে দিল্লীতে 'আউটসাইডার' (বহিরাগত) হিসেবে জানিয়ে বলেন, 'ইনসাইডার' হয়ে ক্ষমতার অলিন্দের দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠেছেন। সরকারের ভিতর যেন ডজন সরকার চলছে। মনে হচ্ছে আলাদা আলাদা জমিদারি এবং ওটা এতটাই যে এক বিভাগ অন্য বিভাগের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে যায়।

ধর্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই ঘটনা আমাদের লজ্জা। কিন্তু তাঁর বক্তব্য— ''মেয়ে কোথাও গেলে বাবা-মা জানতে চায় সে কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু ছেলেদের কি আমরা প্রশ্ন করি, কোথায় যাচ্ছে, বন্ধু কে? ধর্ষণকারীরা তো কারও না কারও ছেলে।'' ছেলে-মেয়েদের সঠিক পথে চালনা করা যে বাবা-মায়ের দায়িত্ব তা উল্লেখ করে পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতেই তাদের পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পপতি এবং যুবকদের বলেছেন, এমন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে যা হবে 'জিরো ডিফেক্ট' ও 'জিরো এফেক্ট' অর্থাৎ একইসঙ্গে ত্রুটিশূন্য ও পরিবেশ-বান্ধব। এছাড়া ঘরে ঘরে শৌচালয়, আদর্শ গ্রাম, ডিজিট্যাল ভারত, প্রধানমন্ত্রী ধন-জন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্যকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছেন।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে নিহত হলে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না শ্রমিকরা

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী মানুষেরা এখানে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেলে কোনো ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। মালদা জেলার এইরকম বহু শ্রমিক উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, চেন্নাই ও মুম্বইতে কাজ করতে যায়। তাদের মধ্যে বেশ কিছু শ্রমিক টাওয়ারের কাজে কিংবা কোনো কোম্পানিতে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা সেই রাজ্য সরকার থেকে কোনো প্রকার টাকা ক্ষতিপূরণ পায় না। ফলে তাদের পরিবারগুলি অনাহারে থাকছে। গত ৫ আগস্ট মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার খাসিমারী স্কুল পাড়ার দু'জন শ্রমিক উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌর আনস্ কোম্পানিতে কাজে গিয়ে ট্রলি দুর্ঘটনায় মারা যায়। এদের নাম কালু রায় (২৬) এবং অঙ্কেশ রায় (২২) তাদের মৃতদেহগুলি লক্ষ্ণৌ-এর রায়বেরিলী জেলার লালগঞ্জ থানা থেকে ময়না তদন্তের পর ফেলে দেয়, অন্যান্য শ্রমিকরা কোনো প্রকারে পলিথিনে বেঁধে গাড়িতে করে তাদের গ্রামে আনে। যে চারজন শ্রমিক একটি গাড়িতে করে দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টায় মৃতদেহগুলিকে এনেছিল তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কালু রায়ের একটি দু' বছরের ছেলে ও একটি মেয়ে আছে এবং অঙ্কেশ রায় মাত্র দেড় বছর আগে বিয়ে করেছিল এবং স্ত্রী ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা রয়েছে। অভাবের তাড়নায় তারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে কাজের জন্য উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের অসহায় পরিবারগুলি এখন সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেও উত্তরপ্রদেশ সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেউ তাদের কোনো প্রকার সাহায্য দিচ্ছে না। ইতিপূর্বে এই গ্রামের কয়েকজন ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেলেও কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি। জেলার মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে জানানো হলে তিনি সাহায্যের আশ্বাস দিলেও কতদিনে তারা সরকারি সাহায্য পাবে তা ঈশ্বর জানেন। কিংবা আদৌ তারা কোনো সাহায্য পাবে কিনা তা বলা যায় না।

২৪ বছরের নিরন্তর সংসদীয় বিতর্কেরই ফসল বিচার বিভাগীয় বিলের আইনি অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিযুক্তি সংক্রান্ত কমিশনের' আইন হিসেবে নথিভুক্ত হওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। বিচারক নিযুক্তির ক্ষেত্রে এই বিল যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে পারবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা ব্যক্ত করে শ্রী প্রসাদ বলেন এই সিদ্ধান্ত মোটেই কোনো তড়িঘড়ি চিন্তার ফসল নয়। বিগত কয়েক দশক ধরে নানান সরকারের অভিজ্ঞতা, আইন ও আইনি কমিশনের সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছিল গরিষ্ঠাংশ মতামতই একটি পর্যাপ্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় নিযুক্তি কমিশনের পক্ষে মত দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বর্তমানে বলবৎ থাকা 'কলেজিয়াম' পদ্ধতিরও বিলোপের সুপারিশ করে।

আইন ও শাসন বিভাগের উভয়ের মধ্যে সুষ্ঠু মেলবন্ধন ঘটিয়েই যে বিচারক নিযুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা যায় সেই উদ্দেশে ১৯৮২, ১৯৯৮ ও ২০১৩ সালে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। তিনি বলেন ৯০-এর দশক থেকে যতগুলি উদ্যোগ নেওয়া হয় তার সবগুলিতেই দেখা যায়— বিচার বিভাগের প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু থেকে যাচ্ছেন। এন ডি এ সরকারই প্রথম হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসন ও বিচার বিভাগ উভয়েরই সমান সমান অংশীদারীর ব্যবস্থা করল। যদিও আমাদের সংবিধান এই সংক্রান্ত একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রশাসনের হাতেই ন্যস্ত করেছিল।

নতুন এন জে এ সি (ন্যাশনাল জুডিসিয়াল অ্যাপয়ন্টমেন্ট কমিশনের) আইন অনুযায়ী বিচারবিভাগের গুরুত্ব খর্ব করার পরিবর্তে বর্ধিতই করা হয়েছে। কেননা তারাই প্রাথমিকভাবে হবু বিচারকদের মনোনীত করবেন। ছয় সদস্যের এই কমিশনের মাথায় থাকছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি তাঁর সঙ্গে থাকছেন সুপ্রিম কোর্টের আরও দুই প্রবীণতম বিচারপতি। তাঁদের তিন জনের মধ্যেই ৫০ শতাংশ নির্ণায়ক ভোট থেকে যাচ্ছে (মোট সংখ্যা ছয় হওয়ায়)। আইনমন্ত্রী আরও বলেন যে বিলটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে ও চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কীভাবে বিচারকদের মনোনীত করবেন সেই সম্পর্কে রাজ্যগুলির কাছ থেকে সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়।

রবিশঙ্কর প্রসাদ

প্রসঙ্গত আইনটির উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ৬ সদস্যের মধ্যে কোনো বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি ২ জন সদস্য আপত্তি করেন সেক্ষেত্রে বিলটি আর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে না যতই বাকি গরিষ্ঠ চার সদস্যেরা ঐকমত্যে পৌঁছন। এই দুই সদস্যের হাতে যে কোনো বিচারপতির মনোনয়নকে নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় বা ভেটো পাওয়ার থাকাকে পূর্বতন আইনমন্ত্রী কপিল সিবাল আইন ব্যবস্থার ওপর তুঘলকি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রত্যুত্তরে আইনমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে ১৯৯৮ সালে নয় সদস্যের সুপ্রিম কোর্টের রায় উদ্ধৃত করে বলেন সেই রায়েই বলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাঁচ সদস্যের কমিটি থাকা জরুরি। আমরা সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছি। অবশ্যই পর্যাপ্ত মতামত সংগ্রহ করার পর।

দেগঙ্গায় আক্রান্ত হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফের আক্রমণের মুখে পড়ল দেগঙ্গায় বসবাসকারী হিন্দুরা। দেগঙ্গার বেড়াচাপা, পালপাড়া এলাকার হিন্দুদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় একদল মুসলমান দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে ১৭ আগস্ট রাত ১০.৫০ মিনিট নাগাদ। জানা যায়, এই দুই গ্রামের হিন্দুদের ঘর-বাড়ি এবং দোকানপাঠ ভাঙচুর করা হয়। সেই সঙ্গে চলে বেধড়ক মারধর। বছর ৩২-এর ব্যবসায়ী দিলীপ পাল ও তাঁর ৬৫ বছরের বৃদ্ধা মা-ও রেহাই পাননি দুষ্কৃতীদের হাত থেকে। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কেন এই ঘটনাটি ঘটল তার উত্তর এখনও অজানা। এর আগে ২০১০ সালে এরকমই এক ঘটনার সাক্ষী ছিল দেগঙ্গার হিন্দুরা। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ হাজি নুরুল-এর মদতে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং ভেঙে দেওয়া হয় বহু মন্দিরও। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিনের ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দুরা ১ ঘণ্টার জন্য রাস্তা অবরোধ করেন। পরে এসডিপিও সুধীর চট্টোপাধ্যায় দুষ্কৃতীদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়ায় স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। স্থানীয় এক বিজেপি নেতার কথায় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করা হলে ১৮ আগস্ট তারা ১২ ঘণ্টার পথ অবরোধের কর্মসূচি নেব।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার প্রয়াস

পুরাণ নির্ভর প্রকৃত ভারতীয় ইতিহাস রচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিদেশিদের শেখানো ইতিহাস পড়ে ভারতবর্ষকে জানার কি শেষ। এবার ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হবে খোদ ভারতীয় আকর উপাদানেই। এমন অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনা। সংগঠনের পক্ষে জানা গিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সামনে রেখে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে এই ইতিহাস রচনার কাজ সমাপ্ত হবে। সংগঠন সূত্র বলছে, ডাঃ হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখার যে সুসংবদ্ধ প্রয়াসের সূচনা করেছিলেন তাকে সম্মান জানাতেই সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষে এই 'পুরাণ নির্ভর ইতিহাস' প্রকাশকে বেছে নেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের ২২ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত গুজরাটের বানকণ্ঠে পালামপুরে দেশের বাছাই করা একশো জন ইতিহাসবিদকে নিয়ে একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে। এঁদের মধ্যে মূলত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপকরাই মুখ্য। আকর সূত্রের অভাবে এবং খানিকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই বিদেশি ঐতিহাসিকরা এদেশের ইতিহাস রচনার সময় তাঁদের মনগড়া ও কষ্টকল্পিত বহু বিষয়ের চর্চা করেছিলেন, যার সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রকৃত ইতিহাসের কোনো মিল কস্মিনকালেও ছিল না। বরং আচার্য যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ইতিহাসবেত্তারা ভারতীয় পুরাণ-মহাকাব্যের মধ্যে এদেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনার ঐতিহাসিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই ইতিহাস সংকলন 'পুরাণ নির্ভর ইতিহাস' প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ভারতীয় পুরাণ অধ্যয়ন সংস্থার নামে একাজের জন্য সম্পূর্ণ নিয়োজিত একটি সংস্থারও সূচনা হয়েছে দিল্লীতে। সংগঠনের পক্ষে সংগঠন-সম্পাদক বালমুকুন্দ পাণ্ডে জানিয়েছেন : 'আমরা ভারতীয় ইতিহাসের আলেখ্য তুলে ধরতে চাইছি এবং সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই ইতিহাসকে বিচার করতে চাইছি। ইতিহাস কেবল ইতিহাসই এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুরাণই হলো এর আকর তথ্য-সূত্র।'

সংগঠনের তরফে এও জানা গিয়েছে যে দেশের ৬৭০টিরও বেশি জেলার ও ৬০০-রও বেশি জনজাতি সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক ইতিহাসও রচিত হবে এই উপলক্ষে। 'পুরাণ নির্ভর ইতিহাস' রচনার প্রকল্পটি ইতিহাস সংকলনের বহুদিনের হলেও জেলার ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনার কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ নতুন। সংগঠনের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক ইতিহাসকারদের একটি সূচিও করা হচ্ছে। এঁদের কাছে তাদের অঞ্চলের ইতিহাস রচনার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আর্থিক-সহ সবধরনের সাহায্যের প্রস্তাবও দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

গুজরাটের ওই বড় সম্মেলনের পর গোটা দেশেই বিভিন্ন প্রান্তে ইতিহাসবিদদের নিয়ে একই ধরনের কর্মশালা আয়োজিত হবে সর্বত্র। সংগঠকদের দাবি, যে আঠেরোটি পুরাণের গল্প শোনানো হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত পুরাণের সংখ্যা একশো ছয় দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের নিরিখে তাঁদের এই দাবি। ফলত ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচনার কাজে এহেন অনুসন্ধান যে বিরাট সহায়ক হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংগঠনের পক্ষে এও জানা গিয়েছে, পুরাণ ভিত্তি করে ভারতীয় ইতিহাস রচনার কাজে সাড়ে আট লক্ষেরও বেশি শ্লোক সংগ্রহ করার কাজ চলছে। পুরাণের শত খণ্ডের বিশ্বকোষ রচনার কাজও চলছে একই সঙ্গে।

আশ্রমে তৃণমূলের আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তর চব্বিশপরগনার মিনাখাঁ থানার রাজেন্দ্রপুর গ্রামের বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের পূজনীয় স্বামীজী মথুরানন্দ মহারাজ দীর্ঘদিন ধরে সেবা কাজ করে যাচ্ছেন। এই উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে তিনি বিনা শুল্কে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করে আসছেন। অত্যাধুনিক কম্পিউটার ট্রেনিং স্কুল ও স্পোকেন ইংলিশ শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। শান্তি মণ্ডল নামে এক ধান্দাবাজ অনেক টাকা আত্মসাৎ করে। সেই কথা জানাজানি হওয়ার পর সে তৃণমূলের আশ্রয় নেয় এবং মহারাজ ও সেবাব্রতীদের বিরুদ্ধে বিজেপি করার অভিযোগ আনে। ভাঙ্গড়ের মুসলমান নেতাদের মদতে বিবেকানন্দ আশ্রমের নানারকম ঝামেলা শুরু করে। পূজনীয় মহারাজ একটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সেখানে চাকরির লোভ দেখিয়ে শান্তি মণ্ডল কিছু যুবককে একত্রিত করে। নানা ভাবে চেষ্টা করেও যখন মানুষদের আটকানো যায়নি তখন একদল যুবক মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এলে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পনের ষোল জন যুবককে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনা ঘটে ২৯ জুলাই মঙ্গলবার। এলাকার মানুষের একটাই প্রশ্ন, তৃণমূলের ইচ্ছানুযায়ী কি সব চলবে? আশ্রমের সেবা কাজও কি তাদের ইচ্ছায় বন্ধ থাকবে? কই মাদ্রাসায় এই ধরনের আক্রমণ হতে শুনিনি। হিন্দুরা নিজেদের টাকায় আশ্রম করেছে। মুসলমান নেতাদের প্ররোচনায় একদল হিন্দু নামধারী তৃণমূল আশ্রম আক্রমণ করবে এ কতদিন চলবে?

লালকেল্লায় লাল পাগড়ি

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
৭, রেসকোর্স রোড, নয়া দিল্লী,

মোদীজী আপনাকে সেলাম। স্বাধীনতার পর জন্ম নেওয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রী আপনি। আর আপনিই দেখালেন স্বাধীনতার নতুন রং। সেই ১৯৪৭ এর পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো প্রধানমন্ত্রী লাল পাগড়ি পরে বক্তৃতা দেননি লালকেল্লা থেকে। আপনি দিলেন। সত্যি আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। কেউ হয়তো বলবে প্রধানমন্ত্রীকে কেমন দেখাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু আমি মনে করি সেটা অনেক বড় কথা। তাঁর কথা শোনার আগে তাঁকে দেখতে হয়। ১২৫ কোটি ভারতবাসীকে যিনি সম্বোধন করছেন তাঁকে প্রথমেই শুধু দেশ বা প্রতিবেশী দেশ নয়, গোটা বিশ্ব দেখে। তারপর শোনে। আর সেই দেখানোর সময় একটি বলিষ্ঠ দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি এই প্রথমবার দেখা গেল। ওই লাল পাগড়িই যেন বলে দিচ্ছিল, 'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম'।

হালের ইতিহাসে কোনো প্রধানমন্ত্রী বুলেট প্রুফ জ্যাকেট না পরে, বুলেটপ্রুফ কাচের ঘেরাটোপের ভিতর না দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে তা দেখা যায়নি। এই মুহূর্তে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি তরুণ প্রজন্ম। তাঁরা তো এমন একজন সাহসী মানুষের হাতেই দেশের দায়িত্ব দিতে চেয়ে আপনাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। তাই তাঁরা এই স্বাধীনতা দিবসে 'ভয় মুক্ত' চিত্তের এক উচ্চ শির প্রধানমন্ত্রীকে দেখে আনন্দিত। ফেসবুক, ট্যুইটারই সেই আনন্দের কথা জানান দিচ্ছে। ইউটিউবে এর আগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় এত 'লাইক' কখনও দেখা যায়নি। তবে সেটা শুধু দেখার জন্য নয়, শোনার জন্যও। আসলে ইদানীংকালে স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে রুটিনের বাইরে অন্য কিছু ভাবেইনি দেশ। তার কারণও ছিল। ভাষণ ছিল আসলে পাঠ। আপনি সেই পথে না হেঁটে হৃদয়ের কথা বললেন নিজের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। তন্ময় হয়ে উঠল গোটা দেশ। দেখল একজন প্রধানমন্ত্রী বলছেন, বৃষ্টি হলে ছাতা চাই না। শ্রোতারা যেমন ভিজবেন তেমন তাঁদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিও বৃষ্টিতে ভিজতে তৈরি।

আপনার কাছে এসবই অবশ্য প্রত্যাশিত ছিল। চলতি ব্যবস্থার দুয়ার ভেঙে বেড়িয়ে আসা জ্যোতির্ময়ের মতোই আপনাকে দেখতে চেয়েছে ভারত। কিন্তু যার জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না গোটা দেশ সেটা শোনা গেল আপনার কথায়। আর সেটা শোনার পর বোঝা গেল দেশকে নতুন সূর্য উপহার দেওয়ার যে আশ্বাস দিয়ে আপনি ক্ষমতায় এসেছিলেন তা কার্যকর করার কথা আপনি ভোলেননি। আর তার জন্য বেশি সময় নষ্ট করাতেও আপনার মন নেই।

নির্বাচনে আপনার স্লোগান ছিল কংগ্রেস মুক্ত ভারত। দেশবাসী যে সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে যায় ফলাফলেই। এবার সত্যি সত্যিই নেহরু-যুগের অবসান ঘটানোর ডাক দিলেন স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য সকালে।

দেশ বুঝল আপনি এক উৎপাদনমুখী নব ভারত নির্মাণ করতে চাইছেন যেখানে কথায় কথায় নেহরুকে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার উচ্চতার মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই সেই নব ভারতের প্রতীক নির্মাণ করেছেন। এবার নীতি নির্ধারণেও তার প্রতিফলন শুরু হলো। ভারতে যোজনা কমিশন ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার মডেলে। তৈরি করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। এবার সেই অকেজো যোজনা কমিশনের অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন আর থেমে থাকা নয়, এবার ভারত এগোবে গতিশীল পথে। উন্নয়ন হবে বাস্তবমুখী। একজন মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া নরেন্দ্র মোদী যে রাজ্যের হাতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ক্ষমাত দিয়ে দেশের ফেডারাল স্ট্রাকচারকেই গুরুত্ব দিতে চাইছেন তা আজ স্পষ্ট।

যোজনা কমিশন যে আসলে ক্ষমতাহীন, অকেজো এক সাদা হাতি তা আগে অনেক প্রধানমন্ত্রীর মুখেই শোনা গেছে। পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রীই হন যোজনা কমিশনের প্রধান। কিন্তু সুযোগ থাকলেও সেই প্রয়োজন ফোরানো প্রতিষ্ঠানের যবনিকা টানার সাহস দেখাননি কেউ। মনমোহন সিং টানা দশ বছর ক্ষমতায় থেকে যোজনা কমিশন সংস্কারের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। এবার আপনি সত্যি সত্যিই নতুন ভারতের খোঁজে অনেক কঠিন এবং সাহসী উদ্যোগটা নিয়ে ফেললেন স্বাধীনতা দিবসের সকালে। যাঁরা যোজনা কমিশনের ভালো মন্দ বোঝার মতো জ্ঞানী নন তাঁরাও বলছেন, ভাল-মন্দ পরে ভাবা যাবে এমন ঘোষণা করার সাহসটাই তো নতুন প্রেরণা জোগাবে দেশকে।

মোদীজী, স্বাধীনতার সকালে আপনি দেশবাসীর প্রত্যাশা আরও বাড়িয়ে দিলেন। দিনের পর দিন চলতে থাকা অনেক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি চায় দেশ। একে একে আপনাকে সব জানলা খুলে দিতে হবে। সব বন্ধ দুয়ারে আঘাত হানতে হবে। নতুন আলোর দেখা পেতে চায় দেশ।

— সুন্দর মৌলিক

কোমর বেঁধে নামলে চৌরঙ্গী ও বসিরহাট দুটি উপনির্বাচনেই জিতবে বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশের সমস্ত বকেয়া উপনির্বাচন হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। আমাদের রাজ্যে বিধানসভার দুটি আসনে ভোট হবে। কলকাতার চৌরঙ্গী এবং বসিরহাট দক্ষিণ। এই দুটি আসনে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও এই প্রথম বিজেপিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সারা দেশের ৩৩টি বিধানসভার আসনে উপনির্বাচন হবে। উপনির্বাচন হবে তিনটি লোকসভা আসনে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসী ও গুজরাটের ভদোদরা লোকসভা আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। পরে তিনি বারাণসী আসনটি রেখে ভদোদরা আসনটি ছেড়ে দেন। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরি আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব। দক্ষিণে টি আর এস দলের প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় তাঁর জেতা মেডক লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হবে।

দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে উপনির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সদ্য ক্ষমতায় আসা বিজেপির জনপ্রিয়তায় যে মোটেই ভাটার টান ধরেনি সে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে দেখাতে হবে যে, নির্বাচনে দলকে জেতাতে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং কৌশল প্রশ্নাতীত। লোকসভার নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে তিনি অসাধারণ সাফল্য পেয়েছেন। সেই সাফল্য উপনির্বাচনেও তাঁকে দেখাতে হবে। তিনি দলের ক্যাপ্টেন। মনে রাখতে হবে, লোকসভার নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীজী প্রচারে যতটা সময় দিতে পেরেছেন, এবার তা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর দায়দায়িত্ব পালন করে তিনি কতটা সময় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে দিতে পারবেন জানা নেই। তাই দলের ক্যাপ্টেনকেই সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে হবে। শুধুমাত্র মোদীজীর ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মা দিয়ে উপনির্বাচনে যে সাফল্য আসবে না সে কথাটি সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে প্রমাণিত হয়েছে। নির্বাচনে একটা ভালো টিম-ওয়ার্ক লাগে। একদা নেহরু-গান্ধী পরিবারের ক্যারিশ্মা দিয়ে কংগ্রেস নির্বাচনে সাফল্য পেয়েছে। এখন সেই ম্যাজিক আর কাজ করে না। আর করে না বলেই সোনিয়া-রাহুলকে সামনে রেখে গত লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব ভরাডুবি হয়েছে। এখন কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের ক্যারিশ্মায় ভোটে জেতা যায় না। উত্তরাখণ্ডের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপির পরাজয়ের কারণ দলীয় নেতৃত্ব উপনির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তা এই প্রতিবেদকের জানা নেই।

গূঢ়পুরুষের

কলম

এবার কিন্তু সারা দেশের ৩৫টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জয়ের জন্য না ঝাঁপালে ভুল হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দলের মধ্যে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানো নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল চরমে। বিশেষত, শহর এলাকার মানুষ শাসক দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তবু ভুললে চলবে না যে গত লোকসভার নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি আসনের ৩৪টিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরাই জয়ী হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মন করি লোকসভা নির্বাচনের পর এবং কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় বসিরহাট এবং চৌরঙ্গী কেন্দ্রে বিজেপির সমর্থকদের সংখ্যা এবার অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০১১ সালের বিধানসভার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে তুলনা করলে ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে বসিরহাট দক্ষিণে বিজেপির ভোটের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫ শতাংশ। লোকসভার নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী পিছিয়ে ছিল প্রায় ৩০ হাজার ভোটে। অন্যদিকে চৌরঙ্গীতে ২০১১ সালের তুলনায় চলতি বছরে লোকসভার নির্বাচনে তৃণমূলের সর্বমোট ভোট কমেছে ১ লাখ ১৬ হাজার। মাত্র তিন বছরে চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ভোটদাতারা শাসক দলের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়েছেন। এটা বোঝা যায় ২০১১ সালের ফলাফল থেকে। তখন কংগ্রেস-তৃণমূল জোট প্রার্থী শিখা মিত্র এই আসনটি জেতেন ৫৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে। শিখা মিত্র পরে মমতার বিষনজরে পড়ে দল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তিনি এই আসনটির বিধায়ক পদ থকে পদত্যাগ করেন। গত লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে দুই নম্বরে ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা। তৃতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাহুল সিনহা প্রায় ৩০ হাজার ভোট পেয়ে দেখিয়ে দেন চৌরঙ্গী কেন্দ্রে বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী। একইভাবে লোকসভার ভোটে বসিরহাট দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য ভোট পান প্রায় ৩৯ শতাংশ। গত ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থী হাজারিলাল সরকার ভোট পান মাত্র ৪ শতাংশ। এক ধাক্কায় ৩৫ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি চমকপ্রদ ঘটনা। লোকসভার ভোটে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি তৃণমূলের চেয়ে ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে ছিল।

রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের প্রাথমিক সমীক্ষা বলছে, চৌরঙ্গী ও বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এবার বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জয় নিশ্চিত করতে গেলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে। দরকার ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক প্রয়াস। কোমর বেঁধে নামলে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি জিতবেই সেকথা আগাম বলে রাখছি।

পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত রাজনৈতিক মেরুকরণ হচ্ছে। মানুষ কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের পরিত্যাগ করছে। রাজ্যের ভোটচরিত্রে পরিবর্তন হচ্ছে। শাসকদল তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ এখন বিজেপি। ■

রাজনীতিতে কর্পোরেট সংস্কৃতি

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

ভালো লাগুক বা মন্দ, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে, রাজনীতি আজ ভারতবাসীর জীবনযাত্রার আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়েছে। যাকে অগ্রাহ্য করে এক পা চলাও কঠিন হয়ে পড়েছে। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে সামাজিক সম্পর্কগুলির সমীকরণ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সমাজের অশিক্ষিত প্রান্তিক মানুষগুলোও নাকি আজ ভীষণভাবে 'রাজনৈতিক সচেতন' হয়ে উঠছে! মানুষের সামাজিক পরিচয়ের থেকেও আজ বড় হয়ে উঠেছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়। সত্যি বলতে কি, কয়েকদশক আগেও এমনটা ছিল না। একটি বিশেষ শ্রেণী, আরও স্পষ্ট করে বললে, সমাজের উঁচুতলার মানুষজন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন, খেটে খাওয়া মানুষরা এটাকে অনধিকার চর্চা বলেই মনে করতেন। আশির দশক থেকে সমাজের আমজনতার রাজনীতিতে বেশি মাত্রায় আগ্রহ ও যোগদান লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

> **সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আজ অপরিহার্য। শুধু তোষণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি দিয়ে সরকার বাঁচানো কঠিন। হাতে-গরম উদাহরণ হল, সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে জনগণ ইউপিএ সরকারকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। তাঁরা চান দায়বদ্ধ, দক্ষ ও সৎ প্রশাসন।**

সাধারণ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে রাজনীতি বলতে নীতির রাজা বা শ্রেষ্ঠ নীতিকে বোঝায়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে রাজনীতি বলতে মানুষ রাজার নীতিকে বুঝতেন। একটি ভূখণ্ডের শাসনকর্তাকে রাজা বলা হোত, যিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে অথবা বংশপরম্পরায় কর্তৃত্ব কায়েম করতেন, জনগণের সম্মতিতে কদাচিৎ নির্বাচিত হতেন। রাজা-প্রজার সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হোত। রাজা সেই ভূখণ্ডের শাসন ও প্রভুত্ব কায়েম করার স্বার্থে নীতি প্রণয়ন করতেন, প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করা তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকতো না। অনেক সময়ই প্রজারা রাজনীতি দ্বারা নিপীড়িত হতেন যার মূল কারণ হোত রাজার সুখ-সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজা-প্রজা সম্পর্কের সমীকরণেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রচুর প্রাণহানি ও রক্তক্ষয়ের পর সম্রাট অশোক উপলব্ধি করেন যে প্রজাস্বার্থ রক্ষা করাই রাজার প্রথম ও প্রধানধর্ম--- 'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ, প্রজানাঞ্চ হিতে হিতম্'। ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি প্রজাদের হিতের জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন। গুরু রামদাসও ছত্রপতি শিবাজীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে রাজার পরিচয় হলো তিনি প্রজার রক্ষকমাত্র।

বৃটিশ শাসনের অবসানে ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম-সমাজতন্ত্র- গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনমানসেও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার ধারণা পরিচিতি পেতে শুরু করে— জণগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। রাজনীতির সংজ্ঞাও পালটে হয়ে যায় রাজ্য বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা এক কথায় প্রশাসনিক নীতি। তবুও ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব রাজনীতিতে জনগণ অবহেলিতই থেকেছেন। আজও জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনের সময় জনসমর্থনের লক্ষ্যে প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের দেওয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতিগুলি ভুলে যান। জনগণের হাতে প্রতিবাদ-আন্দোলন ছাড়া আর কোনো বিশেষ ক্ষমতা থাকে না যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পালনে অথবা তাঁদের ন্যায্য পাওনা দিতে বাধ্য করাতে পারেন। অথচ অন্যদিকে, জনপ্রতিনিধিরা ও তাঁদের চ্যালা-চামুণ্ডারা জনগণের উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করে অচিরেই ফুলে ফেঁপে ওঠেন। আমজনতার করের অর্থে চলে বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী তোষণ যা তাঁদের 'ভোটব্যাঙ্ক' গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই দায়বদ্ধতার অভাবই সমস্ত রকম রাজনৈতিক দূষণ ও দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। আক্ষরিক অর্থে জনগণের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকলেও, বাস্তবে তাঁদের হাতে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা ছাড়া আর বিশেষ কোনো ক্ষমতা থাকে না। আজ তাই

জনগণের মধ্যে সমস্ত নেতা-মন্ত্রীদেরকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়— 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'। এটাই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রচলিত সংস্কৃতি— দায়বদ্ধহীনতা। শুধু দু'একটি ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই দূষণ আপামর জনমানসে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছে যে সরকারি টাকা হলো লুটের মাল। কোনো ভাবে রাজনীতিতে নিজের একটু জায়গা করে নিতে পারলে বা নেতা-মন্ত্রী-আমলার গা-ঘেঁষা হতে পারলে যেমন খুশি সরকারের টাকা লোটা যায়। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে শিল্প ও বাণিজ্যমহলের একটি সফল কর্মসংস্কৃতি হলো 'কর্পোরেট সংস্কৃতি'। তাহলে কর্পোরেট সংস্কৃতির সঙ্গে এর মিল কোথায়? মিল নয়, বরং কর্পোরেট সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিপরীত ধারণা। অর্থাৎ কর্পোরেট সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হলো দায়বদ্ধতা। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা শুনতে একরকম হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক আছে। দায়িত্ব অনেকটাই নিয়মমাফিক। দায়িত্ব থাকলেই সবক্ষেত্রে যে দায়বদ্ধতা থাকবে এমনটা নয়। দায়বদ্ধতা হলো বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য দায়িত্ব। অর্থাৎ দায়বদ্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে একপ্রকার শাস্তিমূলক বিধান যা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ফল হিসেবে ভাবা যেতে পারে। কর্পোরেট সংস্কৃতিতে দায়িত্ব আর দায়বদ্ধতাকে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করা হয়। তাহলে বাধ্যবাধকতা কোথায়? সেটা হলো চাকুরি টিকিয়ে রেখে মোটা মাইনে পাবার বাধ্যবাধকতা। অর্থনীতির বিশ্বায়নের হাত ধরে বিশ্বজুড়ে বহুজাতিক সংস্থার উত্থান, যাদের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফার সর্বাধিককরণ ও বিশ্ববাজারে প্রভুত্ব কায়েম করা। আর ধারাবাহিক ভাবে এ ব্যাপারে সাফল্য পেতে চাই কঠোর অনুশাসন। তাই বলে কি সংগঠনের সর্বত্র একটা চোখ রাঙানি বা ভয়ের আবহ থাকবে? ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তা নয়। কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রথম পাঠই হলো সংগঠনে নিযুক্ত সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে 'সংস্থাগত সাধারণ লক্ষ্য'-এর ধারণা বদ্ধমূল করা। অর্থাৎ সংস্থায় নিযুক্ত সব তলার কর্মীরা তাঁদের পেশাগত উৎকর্ষ ও কার্যদক্ষতা বাড়িয়ে সংস্থাকে লাভজনক করে তুলবে। সংস্থা লাভজনক হলে কর্মীদেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। একদিকে যেমন থাকবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবার দায়, তেমনি অন্যদিকে থাকবে কর্মীদের অনুপ্রাণিত বা উজ্জীবিত করার কৌশল। এর জন্য থাকবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজের পর্যালোচনা করে তাঁদের ভালো কাজের প্রশংসা করা এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে আরও উন্নতি প্রয়োজন তা নির্দেশ করার কৌশল। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে সফল পেশাদারের উদাহরণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য থাকে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। কর্মীদের নিজেদের কাজের গণ্ডীর ভেতরে দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী বা চেনা ছকের বাইরে নতুন চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসমস্ত কৌশল ব্যবহার করে যদি দেখা যায় যে কোনো কর্মী তাঁর কাজে উৎকর্ষ দেখাতে পারছেন তবে তাঁর পদোন্নতি হয় এবং ব্যর্থ কর্মীদের সংস্থা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রূঢ় কিন্তু বাস্তব— প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার এটাই মূলমন্ত্র। কিন্তু ভারতের প্রশাসনিক স্তরে এতদিন এমন উদ্যোগের দেখা মেলেনি। সময় এগিয়েছে, ভারতীয় গণতন্ত্র সাবালক হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনিক সংস্কৃতির বিশেষ একটা পরিবর্তন ঘটেনি। দপ্তরে যখন খুশি আসা যায়, যখন খুশি চলে যাওয়া যায়, অনেকটা 'হরিঘোষের গোয়াল'। একবার সরকারি কাজে ঢুকতে পারলে সারাজীবন কাজ না করেই বেতন ও অবসর সময়ে মোটা পেনশন পাকা। অনেক কর্মচারী বহুদিন ধরে চাকরি করছেন, কিন্তু তাদের ঠিক কি কাজের দায়িত্ব তা জানে না বা বোঝে না। 'আসি, যাই, মাইনে পাই' এরকম অদ্ভুত আত্মঘাতী মানসিকতা প্রশাসনিক স্তরে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান যেখানে কাজ না করাটাই দস্তুর। এই দুষ্টচক্র এতটাই শক্তিশালী যে বেশিরভাগ সরকারই এঁদের চটাতে চায় না। তাই প্রশাসনকে যতই ঢেলে সাজানো হোক বা পরিকল্পনা খাতে যত অর্থই বরাদ্দ হোক না কেন, আখেরে তা অশ্বডিম্ব প্রসব করে। ফলস্বরূপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতের স্থান আজ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির সারিতে।

কিন্তু দিনে দিনে ভারতীয় রাজনীতিও ভীষণ প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়েছে। জনগণ বুঝতে পারছেন যে তাঁদের জন্যই সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়ছে। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আজ অপরিহার্য। শুধু তোষণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি দিয়ে সরকার বাঁচানো কঠিন। হাতে-গরম উদাহরণ হল, সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে জনগণ ইউপিএ সরকারকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। তাঁরা চান দায়বদ্ধ, দক্ষ ও সৎ প্রশাসন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কর্পোরেট জগতের সঙ্গে প্রশাসনিক কাজের বৈশিষ্ট্যগত অনেক ফারাক রয়েছে। প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে বহু নীতিগত ও রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত থাকে। তবে বৈশিষ্ট্যগত যত ফারাকই থাকুন না কেন, মৌলিক লক্ষ্যে এদের মধ্যে বিশেষ একটা প্রভেদ নেই— কর্পোরেট সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি, আর প্রশাসনিক নীতির উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। তাছাড়া কর্পোরেট জগতের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের মতো শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিরা আজ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছেন। তাঁরাই বা কেন কর্পোরেট সংস্কৃতির তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁদের কর্মসংস্কৃতিতে সেগুলি সংযোজন করতে পারবেন না? সরকারি আমলাদের যদি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকে, তবে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কেন তাঁরা উন্নততর সংস্কৃতি অনুসরণ করবেন না?

তাই একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ভারতীয় প্রশাসনের কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রবর্তনের চিন্তার মধ্যে একদিকে যেমন মোদীজীর যুগোপযোগী মনোভাব প্রকাশ পায়, তেমনি অন্যদিকে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে তাঁর আন্তরিকতার মুখটিও স্পষ্ট হয়। ■

বিজেপি-র সভাপতি পদে অভিষিক্ত অমিত শাহ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নব নিযুক্ত সভাপতি অমিত শাহের অভিষেকের দিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর একান্ত নির্ভরযোগ্য সহযোদ্ধাকে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে দলে বিপুল জয়ের কান্ডারি বোঝাতে ক্রিকেটীয় পরিভাষায় 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' আখ্যা দিয়েছেন। শতকরা ১০০ ভাগ সঠিক অভিধা। নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে প্রায় ডজন খানেক ভোট ভবিষ্যদ্বাণী করা চ্যানেলের গরিষ্ঠাংশই বিজেপি-র ক্ষমতা দখলের আগাম ইঙ্গিত দিলেও দল একক ক্ষমতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে এমন দুঃসাহস কেউই দেখাতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছে তা এখন সকলেরই জানা। রাজনীতির খবরাখবর রাখা যে কোনো সাধারণ ভারতীয় এটা মানেন যে উত্তরপ্রদেশের আক্ষরিক অর্থেই অবিশ্বাস্য ফলাফলই বিজেপি-কে দিল্লীর রাস্তা ধরিয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছিল ৮০ আসনে ৭৩টি আসন দখল। অবশ্য এতে আপনা দলের দুটি আসন ছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে এই রেকর্ড আগামী দিনে ভাঙ্গার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বলা যায় অসম্ভব। জয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তো অভিধা দিতে হবে। সেই নিরিখে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' বললে ফলাফলের চূড়ান্ত অভিঘাতটি বুঝতে সুবিধে হয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, উত্তরপ্রদেশে ৭টি আসন তো অন্য দলের হাতে গেছে? গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ডের মতো আরও কয়েকটি রাজ্যে তো অন্য দলগুলি খাতা খুলতেই পারেনি। ঠিকই, তবে এই রাজ্যগুলিতে ২০০৯-এর নির্বাচনেও দল ভালো লড়াই দিয়েছিল। এবারে তেড়ে ফুঁড়ে উঠেছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ! যে রাজ্য বিনা, বিশেষজ্ঞদের মতে দিল্লীর ক্ষমতা অধরাই থেকে যায়, সেখানে বিজেপি ছিল ছন্নছাড়া। আসন সংখ্যা ৮০-র মধ্যে সাকুল্যে দশটি। গুজরাট, রাজস্থানের ক্ষেত্রে অনেকটা নীরোগ ছেলেকে ট্রেনিং দিয়ে ব্যায়ামবীর বানানো এমন ভাবা যেতে পারে। কিন্তু ১০ আসনের রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত উত্তরপ্রদেশে প্রায় মরা ছেলেকে 'বিশ্বশ্রী' খেতাব জেতানোর মতোই অবিশ্বাস্য ৭৩টি আসন জেতা।

প্রসঙ্গত সোভিয়েত বিপ্লবকে চিরকালীনভাবে স্মরণে রাখতে একটি বিখ্যাত বই-এর কথা অনেকেই পড়েছেন বা শুনেছেন। চূড়ান্ত বিপ্লবে ক্ষমতা দখল হয়েছিল ১০ দিনে। তাই জন রিডের সেই আশ্চর্য ঘটনা-বিবরণীর নাম Ten Day's that shook the World। ৪৯ বছরের অমিত শাহ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার বহু আগে থেকেই তাঁর লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। হয়ত ৩ মাস তিনি উত্তরপ্রদেশে ঘাঁটি গেড়ে তাঁর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। অবশ্যই তাঁর সঙ্গী ছিলেন অগণিত নিবেদিত প্রাণ কার্যকর্তা। ভেঙে পড়েছিল ক্ষমতাকেল্লা। এই ৩ মাসকে বলা যেতেই পারে 'তিন মাস যা ভারত কাঁপিয়ে দিল'। হ্যাঁ, তুমুল মোদীঢেউ, দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের প্রতি জনঅসন্তোষ, নতুন ভোটারদের পরিবর্তনেচ্ছা— এসবই নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল, মানতেই হবে কিন্তু সব কিছুকে হিসেবে এনেই তো প্রধানমন্ত্রী শিরোপাটি দিয়েছেন। তাই একটু দেখা যেতে পারে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কনিষ্ঠ কর্মীর দেশের জাতীয় দলের সভাপতি হওয়ার যাত্রাপথটি কেমন ছিল।

আর এস এস-এ অঙ্গীভূত :

না, তিনি কখনই শুরু থেকে জনসঙ্ঘ বা বিজেপি-র সদস্য ছিলেন না। প্রবীণ আর এস এস কার্যকর্তা গুজরাটের রতিভাই প্যাটেল জানাচ্ছেন, ৮০-র দশকে অমিতভাই ছিলেন একজন একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক-কার্যকর্তা। অনেকেই তাঁকে আমেদাবাদের ফাঁকা দেওয়ালে পোস্টার মারতে দেখেছে। প্রচারক জীবনের কর্তব্য হিসেবে নানান জায়গায় আর এস এস-এর মতাদর্শ ফেরি করে বেড়িয়েছেন। তাই তো উত্তরপ্রদেশের ভোট পরিচালনায় বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে আর এস এস থেকে ডেকে নিয়েছেন ৪৪ বছরের সুনীল বনসলকে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কৌশল ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির সহায়তায় বিশ্বাসী শাহ উত্তরপ্রদেশে খুলেছেন প্রশিক্ষিত কলসেন্টার। এখানকার কর্মীরা ২০ হাজার উৎসাহীকে সক্রিয় বিজেপি কর্মীতে রূপান্তরিত করেছে। পেশাদারিত্বে আস্থাবান শাহ প্রতিটি বুথ কমিটির সদস্যকে মোবাইল ফোন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যারা প্রতিদিন কলসেন্টারের নির্ধারিত ব্যক্তিকে

দৈনিক অগ্রগতি রিপোর্ট করত। কলসেন্টার থেকে সরাসরি পরিস্থিতির খবর দেওয়া হোত বনসলকে, তাঁর পাশেই থাকতেন শাহ।

আর এস এস-এর সহ-সরকার্যবাহ (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক) ড. কৃষ্ণগোপাল (স্বস্তিকা দপ্তরে পরিচয় হয়েছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষটির সঙ্গে) জানাচ্ছেন, উত্তরপ্রদেশের যে প্রত্যন্ত গ্রামে অন্য রাজনৈতিক দল ঢোকার কোনো চেষ্টাই করেনি সেখানে অমিত শাহের মস্তিষ্ক-প্রসূত 'মোদী ভ্যান' ব্যগ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে মোদীর রেকর্ড করা ভারত উন্নয়নের আশার বার্তা। এমনি কি সাফল্য আসে? সভাপতি হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বরিষ্ঠ প্রচারক রামমাধব (৪৯) ও শিব প্রকাশ (৫০)। এই রামমাধব গত দশ বছর আর এস এস-এর মিডিয়া সেল সামলাতেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন দলের জাতীয় সভাপতি অমিত শাহকে।

"অনেকেই বলছেন মোদী-অমিত শাহ-র হাত ধরে বিজেপি-তে নবযুগ শুরু হলো। কথাটা হয়ত সত্যি। শাহ তারুণ্যের ওপর সদা ভরসা রাখছেন। তিনি হিসেব রেখেছিলেন ১১ কোটি নতুন ভোটার গত নির্বাচনে যোগ হয়েছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই 'খেলা ঘুরিয়ে দেওয়া' নবীনদের বিজেপি'র দিকে ঘোরাতে হবে। সফলভাবেই সেই ফিল্ডিং সাজেয়েছিলেন যাতে এরা মাঠের বাইরে না চলে যায়।"

অনেকেই বলছেন বিজেপি-তে নবযুগ শুরু হলো। কথাটা হয়ত সত্যি। শাহ তারুণ্যের ওপর সদা ভরসা রাখছেন। তিনি হিসেব রেখেছিলেন ১১ কোটি নতুন ভোটার গত নির্বাচনে যোগ হয়েছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই 'খেলা ঘুরিয়ে দেওয়া' নবীনদের বিজেপি'র দিকে ঘোরাতে হবে। সফলভাবেই সেই ফিল্ডিং সাজেয়েছিলেন যাতে এরা মাঠের বাইরে না চলে যায়। তুলনামূলক ভাবে কমবয়সী রামমাধব ও শিবপ্রকাশ ছাড়া তরুণ বনসলেরও গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে বিজেপি-র দৃষ্টিভঙ্গির অভিমুখ।

এই মর্মে অমিত শাহের অভিষেক ভাষণটি যে-কোনো রাজনৈতিকভাবে উচ্চাভিলাষী বা বিজেপি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু নাগরিকের খেয়াল রাখা উচিত। তিনি বলেছেন, ''দেশে ১২০০'র বেশি রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু এমন একটি দলও সম্ভবত নেই যেখানে একেবারে নীচুর তলায় কাজ করা কোনো কর্মী দলের সর্বোচ্চ পদ— জাতীয় সভাপতি হওয়ার সুযোগ পায়।'' এই অনুভূতি শাহের জীবনে নিশ্চিতভাবেই আর এস এস-বিজেপি-র যৌথ সংযোজন। কথাটির যেন এক অতীত যোগসূত্র ছিল। ঠিক ১২ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। তখন কেন্দ্রের ক্ষমতায় রাষ্ট্রনায়ক অটলবিহারী বাজপেয়ী। ৩ আগস্ট ২০০২ সালে দিল্লীর টইটম্বুর তালকাটোরা স্টেডিয়ামে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন বেঙ্কাইয়া নাইডু। তিনি সেদিন অভিষিক্ত হয়েছিলেন বিজেপি সভাপতির গরিমাময় পদে। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বেঙ্কাইয়া একই কথার যেন প্রতিধ্বনি করেছিলেন 'দেশের দক্ষিণতম রাজ্যের প্রত্যন্ত এক কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়া থেকে দলের সাধারণ কর্মীর পর্যায় পেরিয়ে জাতীয় স্তরে দলের সভাপতি হওয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্মানটি অর্জন করতে পারা একমাত্র বিজেপি দলেই সম্ভব। আমি অভিভূত।' আর বলতে পারেননি বেঙ্কাইয়া। প্রসঙ্গত বেঙ্কাইয়ার বয়সও তখন বেশি ছিল না।

নতুন সভাপতি :

দলের কনিষ্ঠতম এই সভাপতির সাহসের অনেক কাহিনীই তাঁর সহকর্মীদের সূত্রে উঠে আসছে। মোদী তাঁকে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন ১৯৮৫ সালের এক আর এস এস

কার্যকর্তা সম্মেলনে। তখন থেকেই হয়ত নিয়তি নির্ধারিত ভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে থাকেন। কংগ্রেসী আমলের ফাঁসিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি তাঁদের ছেড়ে কথা বলেনি। সোহারাবুদ্দিন-তুলসী প্রজাপতি ভুয়ো সংঘর্ষের মামলায় ২০১০ সালে তাকে হাজতবাসও করতে হয়েছে। তিন মাস পরে জামিনে মুক্ত হন। তকমা দিয়ে দেওয়া হয় প্রায় হিন্দু সন্ত্রাসবাদীর। তাতে এতটুকুও মাথা নোয়াননি। কংগ্রেসী জমানার সেই মামলা এখনও চললেও প্রমাণাভাবে তার ধার নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু খুঁটির জোরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সিবিআই শাহকে দু' বছর গুজরাট থেকে নির্বাসিত করতে পিছপা হয়নি। এই নির্বাসনকেই তিনি অস্ত্র হিসেবে শান দিয়ে নেন। দিল্লীর নেতাদের কাছাকাছি এসে ঘোঁজঘাঁজ বুঝতে থাকেন। আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এতটাই নিখুঁত ছিল যে তখনই তিনি দিল্লীর ক্ষমতা বলয়ের আবাসস্থল জঙ্গপুরা এক্সটেনশনে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা শুরু করেন। উত্তরপ্রদেশকে পাখির চোখ করে ভাবতে থাকেন নতুন কোনো শক্তিবিন্যাস তৈরি করা যায় কিনা। উত্তরপ্রদেশেই যে সংরক্ষিত রয়েছে ভারত জয়ের গূঢ় সঙ্কেত তা বুঝতে দেরি হয়নি এই ক্ষুরধার বুদ্ধি রাজনীতিকের। তিনিই দায়িত্ব পেয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশে দলের নির্বাচন পরিচালনার। একবার মনস্থির করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তাঁকে যে আর টলানো যায় না তার মাত্র একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। ২০১৪-র মার্চ মাস অবধি স্থির হয়নি মোদী উত্তরপ্রদেশ থেকে লড়বেন কিনা। মোদী কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন শাহের ওপর। তিনি ঠিক করলেন হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির পীঠস্থান বারাণসীই হবে মোদীর তুরুপের তাস। খেয়াল মেনে নয়, সবটাই জেতার সম্ভাবনা অনুযায়ী।

ভাঙলেন মায়াবতীকে :

'তিলক তরাজু আউর তলোয়ার ইনকো মার জুতি চার'-এর স্লোগান বলয় থেকে বেরিয়ে মায়াবতী যেমন ব্রাহ্মণ, দলিত ও অন্য উঁচু জাতের সমীকরণে নতুন সামাজিক শক্তিবিন্যাস তৈরি করে উত্তরপ্রদেশে বাজিমাত করেছিলেন, সেই ফরমুলারই গোড়া ধরে টান দিলেন অমিত শাহ। ভোটারদের বোঝালেন উত্তরপ্রদেশ থেকেই নির্বাচন লড়ে এক ওবিসি নেতার দিল্লীর সিংহাসনে বসার সম্ভাবনা তৈরি। ওবিসি নেতাই পিছড়ে বর্গের মানুষের দৈনন্দিন দুর্দশার কথা বুঝতে পারেন। তিনি নিজে চা বিক্রি করতেন। আজ যে কাঁসিরামকে ভারতরত্ন দেওয়ার হাওয়া উঠেছে, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনেই শাহ এই প্রসঙ্গ দলিতদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। মায়াবতীর দলিত বৃত্তের বাইরে থাকা বিক্ষুব্ধ বাল্মীকি পাসি সোনকার ও অন্যান্য জাটভ নয় এমন সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখিয়েছিলেন শুধু 'জাটভ' সম্প্রদায়ের লোকেরই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তাঁদের কিছু হয়নি। এদের তুলে আনতে নির্মমভাবে লোকসভার টিকিট বাঁটোয়ারা করলেন। বাদ পড়লেন অনেক তথাকথিত প্রত্যাশী। ২৭ জন ওবিসি প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যাদের ৯০ শতাংশই জিতে আসেন। অমিত শাহ'র যোগসূত্র রয়েছে মাটির সঙ্গে। তিনি যেখানে নামেন হাতের তালুর মতো চিনে নেন স্থানীয় ইস্যুগুলোকে। শাহ তাঁর গুরু মোদীর মতোই প্যালেস-পলিটিক্স-এ বিশ্বাস করেন না।

সামনের দিন :

যে যে রাজ্যে বিজেপি দুর্বল কিন্তু সম্ভাবনাময় তারা সবাই এখন অমিত শাহকে পেয়ে চমৎকার দেখাতে চায়। কিন্তু তাঁর সামনে লক্ষ্য বিশাল। কংগ্রেসমুক্ত ভারতের স্বপ্ন সফল করার পথে প্রথমেই কড়া নাড়ছে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের নির্বাচন। চিরবিতর্কিত আবদুল্লাদের পারিবারিক সম্পত্তি ভেবে নেওয়া জম্মু-কাশ্মীরে কিছু করে দেখাতে তিনি বদ্ধপরিকর। মাঝখানে সভাপতি হওয়ায় তাঁর হাতে মাত্র ১৮ মাস সময়। প্রধানমন্ত্রীর ঘনঘন কাশ্মীর যাত্রা সেই ভাবনারই প্রতিফলন। শাহ চান, আর এস এস-এর সঙ্গে আরও ঘন সন্নিবদ্ধ সম্পর্ক ও পারস্পরিক চিন্তাভাবনার আদান প্রদান। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে কার্যকর্তাদের শক্তিশালী করে দিকবিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া।

তাই আজ অমিত শাহের উত্থান যত না বিজেপি-তে নতুন দিনের দিশা দেখাচ্ছে তার থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক বেশি সন্দিহান আর দিশাহীন করে তুলছে ক্ষমতা হারানোর শোকে নিমজ্জমান তাঁর বিরোধীদের। ■

রামমাধব অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন নবনির্বাচিত সভাপতি অমিত শাহকে।

‘একটা অমিত শাহ গেলে মোদীর কোনো যায়-আসে না’

বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র বিপুল সাফল্যের পেছনে অমিত শাহের ভূমিকা ছিল অবিসংবাদিত। উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব পেয়েই এই তরুণ তুর্কী দেশবাসীর চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আপাতত তাঁর কাঁধে সারা দেশের বিজেপি-র দায়িত্ব। কীভাবে সামলাবেন এই রাজ্যপাট? ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার বরিষ্ঠ সম্পাদক উদয় মাহুরকর বিজেপি-র এই তরুণতম সভাপতির যে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর পত্রিকায়, তাই বাংলা তর্জমায় প্রকাশিত হলো।

নতুন বিজেপি সভাপতি হিসেবে আপনার সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ কী?

আমি এটাকে কর্তব্য হিসেবে দেখছি। আমরা সবেমাত্র একটা চ্যালেঞ্জ জয় করেছি লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে। আমার কাজ পাঁচ প্রকারের। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো জনগণ ও সরকারের মধ্যে শক্তিশালী যোগসূত্র রূপে বিজেপিকে গড়ে তোলা। তারপর আমরা তৈরি করবো এবং ভোট ছিনিয়ে আনা মেশিনারি রাখতেও পারি— রাজ্যগুলিতে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে সেই রাজ্যগুলিতে যেখানে সাম্প্রতিক নির্বাচনে আমাদের জনপ্রিয় ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আসন সংখ্যা বাড়ানো যায়নি। অথবা যেখানে আসন সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে; যেমন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই তালিকায় পড়বে, সেখানেও ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এরপর আমাদের লক্ষ্য হবে মহারাষ্ট্র-সহ অন্যান্য রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে লোকসভা ভোটের মতোই চিত্তাকর্ষকভাবে জেতা। আমাদের বর্তমান জনপ্রিয়তার ওপর ভর করে আমরা দলীয় সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পেরেছি। আর শেষ কথা বলব যে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে বিজেপি কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এমনকী যখন নরেন্দ্রভাই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি এনিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, যেহেতু তিনি সর্বদা অনুভব করতেন যে দলীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সরকারি কর্মসূচিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে।

দলীয় সংগঠনে কোন পরিবর্তনের ভাবনা আপনার মনে রয়েছে?

আমরা সেই অঞ্চলগুলিতে পৌঁছতে চাইছি যেখানে বর্তমানে আমাদের অস্তিত্ব নেই। এর জন্য আমরা ই-রেজিস্ট্রেশনের মতো কৌশল ব্যবহার করছি। আমাদের এখন একটাই পরিবর্তন প্রয়োজন যে যথাসম্ভব আধুনিক কারিগরি কৌশলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে মানুষকে দলের আরও কাছে আনা। আমরা একটি নতুন সফটওয়্যারের প্রচলন করেছি যা দিল্লীতে থাকা দলের

সভাপতি ও অন্যান্য পার্টি নেতৃত্বকে অনেক অন্তরঙ্গ করেছে। দেশের আসন্ন ক্ষুদ্রতম নির্বাচনগুলিতেও এই আধুনিক প্রযুক্তি থাকবে। তৃণমূল স্তরে আদর্শবাদী প্রশিক্ষণের ওপরও আমরা আরও জোর দিচ্ছি। একইসঙ্গে প্রয়োজন যাতে সারাদেশে আমাদের সমস্ত প্রকাশনগুলির মধ্যে একটি সাযুজ্য বজায় থাকে। যার ফলে দলের তরফ থেকে একটি সাধারণ জাতীয় বার্তা পাঠানো সম্ভবপর হবে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যুবকদের মোহমুক্তির জন্যও আমরা নয়া পন্থা অবলম্বন করতে চাইছি।

 যেহেতু বর্তমানে বিজেপি কেন্দ্রের মুখ্য চালিকাশক্তি, তাই অদূর ভবিষ্যতে তারা কি ক্ষমতায় থাবা বসাতে চাইবে না?

 কোনও একটা দল ক্ষমতায় এলে পরে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আদর্শগত শিক্ষা-দীক্ষার জন্যই বিজেপি ও আর এস এসের একদল কর্মী রয়েছেন ক্ষমতার মোহ যাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

 আপনি নরেন্দ্র মোদীর দক্ষিণহস্ত। এখন আবার দলের নেতৃত্বেও। বাজপেয়ী সরকারের আমলে যেমন দল ও সরকারের মধ্যে সমস্যা ছিল, তা পুনরায় না ঘটার সম্ভাবনা কতটা?

 আমি যে নরেন্দ্র ভাইয়ের দক্ষিণহস্ত, এটা সংবাদমাধ্যমের ধারণা। আমাদের মধ্যে কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। তিনি প্রত্যেক কর্মীকে বিশ্বাস করেন যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন এবং যাঁদের প্রতিভা রয়েছে ও ভালো ফল দেবার ক্ষমতা আছে। দলের কাজ হলো জনগণ ও সরকারের মধ্যে একটি সেতু রচনা করা। যখন বাজপেয়ী সরকার ক্ষমতায় ছিল। তখন আমাদের স্বস্তিদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এখন কিন্তু সেই পরিস্থিতি নেই।

 আপনি এখন সবে ৪৯। আপনার ওপর কি প্রভূত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না?

 আমার দায়িত্ব বিজেপি-র এই সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটা একা একজনের কাজ নয়। এটা টীমওয়ার্ক। এমনকী উত্তরপ্রদেশে দলের সাফল্যের যে কৃতিত্ব আমাকে দেওয়া হয় তাও এসেছে টীমওয়ার্কের ফলেই।

 বাজপেয়ী জমানায় আদর্শগত ইস্যুতে আর এস এসের চাপ বড় ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপনি কেমন করে তা সামলাবেন?

 আর এস এস বিজেপি-র দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করে বলে সংবাদমাধ্যমের যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল।

 কিন্তু আর এস এস নেতা রামমাধব যখন বিজেপি-তে যোগদান করেছেন, তখন আর এস এসের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই বিজেপি-র ওপর শক্ত হবে?

 আর এস এস কর্মীদের বিজেপি-তে যোগদান পুরনো অভ্যাস। আমি নিজেও একজন আর এস এস কর্মী।

 সুদীর্ঘ সময় নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কাটানোর পর আপনার তাঁর কাছে পাওয়া বৃহত্তম শিক্ষা কী?

 নরেন্দ্রভাই আমাকে শিখিয়েছেন প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তুমি যদি নিজেকে সামলে রাখতে পার, তবে তুমি গন্তব্যে পৌঁছবেই। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই তিনি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন এবং গুজরাটে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে চালু ব্যবস্থাতেও ভালো প্রশাসন দেওয়া সম্ভব। প্রশাসনের নীতির তিনি যে উন্নয়ন ঘটিয়েছেন, তাই এখন জাতীয় স্তরে অসাধারণ ফল দিচ্ছে।

 মোদীর থেকে অমিত শাহকে বিয়োগ করে দিলে কী হবে?

 একটা অমিত শাহ গেলে মোদীর কোনো যায়, আসে না।

 কিন্তু আপনি কীভাবে এগোবেন? সোহরাবুদ্দিন শেখ এনকাউন্টার মামলায় সিবিআই আপনাকে জেলে পাঠিয়েছিল। আপনি এখনও জামিনে রয়েছেন।

 অবাঞ্ছিত সমালোচনা আমাকে বিচলিত করতে পারেনি। আমার বিরুদ্ধে ওই এনকাউন্টার মামলা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ধর্মত আমার কাজ করেছি এবং প্রতিটি কাজে একমাত্র দলকেই পাশে পেয়েছি।

 আপনি দৃশ্যত একজন হিন্দু কট্টরবাদী নেতা। বিজেপি সভাপতি হিসেবে আপনার নিয়োগকে মুসলমানরা কী চোখে দেখবে?

 আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' (সবার সাথে, সবার উন্নয়নে') স্লোগানের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। আমার মুসলমান-বিরোধী ইমেজটা সংবাদমাধ্যমের সৃষ্টি। আমি কেবলমাত্র কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণের বিরোধী। আমাদের দলীয় আদর্শও এটাই।

 কিন্তু উত্তরপ্রদেশে আপনি একজনও মুসলমানকে একটি টিকিটও দেননি।

 এটা দলীয় সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা নির্বাচনে কারুকে প্রার্থী করার সময় তিনি হিন্দু না মুসলমান তা নিয়ে ভাবি না। তাঁর জয়ের ক্ষমতা আছে কিনা সেটাই একমাত্র বিবেচ্য থাকে।

 কিন্তু উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন তো আপনি মুসলমান-বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন?

 ভুল কথা। আমি আমার সমস্ত বক্তব্যে শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশ সরকারের অপকর্ম ও প্রতিহিংসাপরায়ণাতাকেই তুলে ধরতে চেয়েছি। আমি এমনকী 'মুসলমান' শব্দটাও একবারের জন্য ব্যবহার করিনি।

 মোদী সরকার তার প্রথম বাজেটে মাদ্রাসার আধুনিকীকরণের জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এটা তোষণ নয়?

 মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ আমাদের কর্মসূচিরই অঙ্গ। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষা চালু করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। একে তোষণ বলা অনুচিত।

 আপনি দলের বরিষ্ঠ নেতাদের আস্থা অর্জন করবেন কীভাবে?

 আমি ইতিমধ্যেই তাঁদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। তাঁদের ঐক্যমত্য ও সমর্থনেই আমি সভাপতি হয়েছি।

 উত্তরপ্রদেশে ওবিসি-নেতৃত্ব তৈরি করার জন্য আপনাকেই কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু গত লোকসভা নির্বাচনে আর এস এস বিজেপি ব্যাকগ্রাউন্ডের নীতিনিষ্ঠ ওবিসি-কর্মীদের দলীয় টিকিট দেওয়া হয়েছিল। অন্যত্রও কি এর প্রতিফলন ঘটবে?

 আমাদের প্রবাদপ্রতিম নেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় 'অন্ত্যোদয়'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। দরিদ্রদের মধ্যে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল। আমরা তাঁর কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি তাই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছি। ■

ম্যান অফ্ দ্য ম্যাচ—অমিত শাহ

দিল্লী থেকে ফিরে দেবব্রত চৌধুরী ॥ ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় কর্মসমিতির অধিবেশন ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হলো দিল্লীর নেহরু স্টেডিয়ামে। দিনটি আগামীদিনে একটি স্মরণীয় বলে গণ্য হতে চলেছে। কারণ ভারতবাসী দেখলো নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ'র যুগলবন্দী এক মিলিত আহ্বান— 'গড়বো আমরা এক ভারত— শ্রেষ্ঠ ভারত'। নরেন্দ্র মোদী ৭৫ দিন আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন। ৯ আগস্ট ভারতীয় জনতা পার্টী ঘোষণা করলো

অমিত শাহ-কে দলের জাতীয় 'সভাপতি' হিসেবে। অমিত শাহ তাঁর ভাষণে বললেন, আজ থেকে ৭২ বৎসর আগে মুম্বই শহরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবাসী তৎকালীন শাসক ইংরেজ সরকারকে 'ভারত ছাড়ো' বলে হুঙ্কার দিয়েছিল। অসংখ্য মানুষ মরলোও, আহত হলো বৃটিশের গুলিতে ও লাঠির আঘাতে। আর কয়েক সহস্র মানুষকে যেতে হলো কারাগারে, এই কষ্ট বৃথা যায়নি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল মাত্র তার ৫ বৎসর পরে— ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। দিনটি ভারতবাসীর কাছে 'ক্রান্তি দিবস' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। অমিত শাহ বলেন, এই এক 'ক্রান্তি দিবসে' আপনারা আমাকে দলের এক গুরুদায়িত্ব দিয়ে সম্মান দিলেন। তার জন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষে ১২০০টি রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু সেই সব দলে একজন সাধারণ কর্মী দলের 'সভাপতি' পদে উন্নীত হতে পারেন তার কর্মকুশলতার জন্য এর প্রমাণ খুব কম। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করে প্রমাণ করে দিল এই দল ভারতবর্ষে এক অনন্য দল। এই দলের কর্মীদের কাছে দলীয় আদর্শ হচ্ছে 'আত্মা' আর কর্মীরা হচ্ছে শক্তি। আমি ঘোষণা করছি, আপনাদের দেওয়া এই দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। আগামী দিনে আপনাদের ইচ্ছামত 'শ্রেষ্ঠ ভারত' গড়ার কর্মযজ্ঞে আমার যথাযথ শক্তি প্রয়োগ করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করবো।

কে এই অমিত শাহ? জন্ম ১৯৬৪ সালে মুম্বই শহরে, পেশায় ডাক্তার (নিউরোলজিস্ট)। বয়স ৪৯ বৎসর। ১৯৯৭ সালে গুজরাটের সরখেজ এলাকা থেকে উপনির্বাচনে প্রথম বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। পরবর্তী ১৯৯৮ ও ২০০২ সালে এখান থেকেই আবার নির্বাচিত হন। ২০০৭ সালে নির্বাচিত হন ইকিলেভিয়া থেকে। ২০১০ সালে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় স্থান পান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে। তারপর এক সংঘর্ষে একজন মহিলা সহ ৩ জঙ্গির মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোর জন্য গুজরাট রাজ্যের বাইরে যেতে হয়েছিল। উনি গিয়ে রইলেন উত্তরপ্রদেশে। তনমন দিয়ে বিজেপি-র শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন। অমিত শাহ তার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিলেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ৭১টি আসন এবার বিজেপি-র পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন, সঙ্গী আপনজন পার্টিকে ২টি আসন পেতে সাহায্য করলেন। মা ও ছেলে ছাড়া কংগ্রেস কোনো আসন পেলো না। মায়াবতী কর্পূরের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেল। আর রাজ্যে শাসক সপা-কে মাত্র ৫টি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। এ এক অমিত শাহ-র খেল। তাজ্জব রাজনৈতিক আঁতেলরা। সেই অমিত শাহ এবার ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ। যথোপযুক্ত নির্বাচন। যদিও ২ বৎসর আগেই অমিত শাহ-কে দলীয় কর্মসমিতির সাধারণ সম্পাদক রূপে নির্বাচিত করেছিল। ৯ আগস্ট অমিত শাহ তাঁর ভাষণে কর্মীদের আহ্বান করে বলেন— "দলকে নিজ এলাকায় শক্তিশালী করুন, স্থানীয় সমস্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠা করুন।" তিনি আরও বললেন, পশ্চিমবাংলা থেকে তামিলনাড়ু এবং কেরলে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী করুন। নিজ নিজ এলাকায় সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনের মতো কাজ করুন।"

পার্টিকে সৌহার্দ্য, সংবাদ ও সমন্বয়— এই তিনটির গুরুত্ব দেওয়ার কথা বললেন। দীনদয়ালজীর একাত্মমানবদর্শন ভাবনার ৭৫ বৎসর পূর্তি হবে ২০১৫ সালে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারে আমরা আছি। অতএব ২০১৫ বৎসর বিশেষ ভাবে পালন করার আবেদন রাখছি। দীনদয়ালজীর আদর্শ ছিল অন্ত্যোদয়। সর্বশেষ তিনি বললেন, গুরুজীর সেই বাণী যা সবাইকে উদ্দীপিত করে— 'বিজয় হি বিজয় হ্যায়'। এগিয়ে চলুন। চরৈবেতি-চরৈবেতি। বললেন, সবকা-সাথ সবকা-বিকাশ। ■

চিঠিপত্র

গীতা হাতে শপথ

স্বস্তিকা ১৪ সংখ্যা ২৬ নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায় সংবাদে প্রকাশ আমেরিকার হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ নির্বাচিত প্রথম হিন্দু আমেরিকান মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, হাওয়াই রাজ্য থেকে। জন্মসূত্রে আমেরিকান তুলসী গ্যাবার্ড গীতা হাতে শপথবাক্য পাঠ করেন। একজন আমেরিকান যা করতে পেরেছেন— আমরা ভারতীয় হিন্দুরা তা করতে পারিনি। কেন?

গীতাশাস্ত্র ভারতীয় হিন্দুদের নিকট পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ভারতে জন্ম আজ অবধি কোনো ভারতীয় নেতাই কখনই গীতা হাতে শপথবাক্য পাঠ করেননি।

ষোড়শ লোকসভায় এই প্রথম সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা ও সাঁওতাল ভাষায় শপথবাক্য পাঠ করতে দেখেছি। কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য ইংরেজিতে শপথবাক্য পাঠ করেছেন। মাতৃভাষা ভুলে ইংরেজিকেই মাতৃভাষা ভাবছেন। আজকাল যে যত বেশি ইংরাজিতে কথা বলতে ও লিখতে পারেন তাকেই সমাজ শিক্ষিত বলে গণ্য করে! দু'শ বৎসরের ইংরাজি ভুত এখনও আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। পার্লামেন্টে যখন জনপ্রতিনিধিগণ কথা বলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিনিধি ইংরাজিতে বলা পছন্দ ও স্বছন্দ মনে করেন। এমন মনে হয় না ভারতীয় পার্লামেন্টের দৃশ্য দেখছি! মনে হয় কোনো বিদেশি পার্লামেন্ট। আমি ইংরাজি বিরোধী নই, ইংরাজি ভাষা আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ভাষা হিসাবে ব্যবহার করাই হবে যুক্তি সঙ্গত। পার্লামেন্টে ভারতীয় ভাষা ব্যবহার ও কাজকর্ম করা উচিত।

বাঙালি রাষ্ট্রপতি ভুলেও একবারের জন্যও বাংলা শব্দ ব্যবহার করেননি। ইংরাজিতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। বাংলা ও বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কোনো সদস্যই— 'বন্দেমাতরম্' বা 'ভারতমাতা কী জয়' উচ্চারণ করেননি। শুধু দর্শকাসন থেকে সেই জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছে— দূরদর্শনের সৌজন্যে।

আশা করেছিলাম— ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যগণ গীতা হাতে এবং 'বন্দেমাতরম্' বা 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনির মাধ্যমে শপথ বাক্য পাঠ করবেন।

আশাহত হলাম। দুঃখও পেলাম। আমরা এ কোন ভারতে বাস করছি!

—অনিল চন্দ্র দেবশর্মা,
দেবী বাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

আমাদের করণীয়

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনায় বলেছিলেন, 'হাজার বছরের পরাধীনতা।'

১১৯২ সালে মহম্মদ ঘুরী শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহ্বানকে যুদ্ধে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছিল। তারপর আর কোনো হিন্দু রাজা দিল্লীর সিংহাসনে বসতে পারেননি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য। ১৯৪৭ সালের পর থেকে হিন্দুস্বার্থ বিরোধী বৈষম্যমূলক আইন কংগ্রেস তৈরি করেছে (উদাহরণ : হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫২)।

হাজার বছর ধরে আমাদের মগজধোলাই চলেছে। শাসকেরা তাদের স্বার্থে যা যা শেখাত তাই শিখতে হোত হিন্দুদের, তারই প্রচার চলেছে। পৃথিবীর কোনো পরাধীন জাতিই স্বাধীনভাবে ইতিহাস লিখতে পারেনি। ভারতবাসীও পারেনি। শাসকদের ভাষা, শাসকদের তৈরি ইতিহাসই হিন্দুদের সত্য বলে মুখস্থ করতে হয়েছে। ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে হাজার বছর ধরে। হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস আর ধর্মান্তরকারী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৪৭ সালে সংখ্যার ভিত্তিতেই ভারতবাসীর জমি বিদেশী সম্প্রদায় দ্বারা বেদখল হয়েছে। কেবল সংখ্যার জোরেই নয়, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট জমি দখল করে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য ডাইরেক্ট অ্যাকসন অর্থাৎ হিন্দুর সম্পত্তি লুঠ, তারপর অগ্নিসংযোগ এবং রাতে হত্যার ঘটনা আরম্ভ করা হয় কলকাতায়। কমপক্ষে ১৩ হাজার মানুষ নিহত হয় প্রত্যক্ষ মহাসংগ্রামে। এর ইতিহাস কংগ্রেস, কমিউনিস্ট রাজত্বে কেন লেখা হলো না? কমিউনিস্টরা ছিল মুসলমানের পক্ষে।

আমরা ধীরে ধীরে জাতিসত্তা হারিয়েছি। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষা ভুলে আমাদের আরবি, ফার্সি, ইংরেজি শিখতে হয়েছে। যে ক্ষতি হাজার বছর ধরে হয়েছে সেই সব ক্ষতিপূরণ দু-দশ বছরের মধ্যে সম্ভব নয়। আর শত্রুরাও চুপ করে বসে নেই। হাজার হাজার বছরের ভারতীয় জ্ঞান ও বিদ্যায় উদ্বুদ্ধ, নিঃস্বার্থ জ্ঞানবৃদ্ধদের পরামর্শে ভারতের ও জগতের কল্যাণে হাজার বছর ধরে এন ডি এ-র নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যাতে চলতে থাকে সেই কাজে নিঃস্বার্থভাবে সকলকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

—কৃষ্ণকান্ত সরকার,
দমদম পার্ক, কলকাতা-৫৫।

পড়া বারণ হলে লেখা নয় কেন?

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে বলেছেন যে আনন্দবাজার পত্রিকা পড়বেন না। কেননা এরা দেশের শত্রু। সেজন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগারগুলি থেকে তিনি আনন্দবাজারকে বহিষ্কৃত করেছেন। ভাল কথা। কিন্তু তাঁর দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়ান আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রোড়পত্র 'প্রস্তুতি'তে দীর্ঘদিন ধরে লিখে চলেছেন। যে স্তম্ভে তিনি লেখেন তার নাম 'নলেজ দর্পণ'। এটি ক্যুইজ বিষয়ক। মূলত ছাত্রছাত্রী ও কর্মপ্রার্থীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করাই এর তথাকথিত উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হলো, দেশের শত্রু হওয়ার জন্য যদি আনন্দবাজার পড়া বারণ হয় তো সেখানে লেখা বারণ নয় কেন? তাও যিনি লিখছেন তিনি যে সে ব্যক্তি নন, তৃণমূলের সর্বভারতীয় এক নেতা। এটা কি দ্বিচারিতা নয়? যে সব গরিব ছাত্রছাত্রী ও কর্মপ্রার্থী পাঠাগারে বিনামূল্যে আনন্দবাজার পড়তে না পারায় ডেরেক ও ব্রায়ান

মহোদয়ের বিতরিত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরাই বা কি দোষ করলেন? সাংসদ ‘দেশের শত্রু’ আনন্দবাজার থেকে নিশ্চয়ই লেখকের দক্ষিণাও নিয়ে থাকেন।

—**প্রদীপ ঘোষ,**
বালী, হাওড়া।

থিওসফি সংক্রান্ত পত্র সমালোচনার জবাব

২১ এপ্রিল ২০১৪’র স্বস্তিকায় আমার রচিত ‘হিন্দু শাস্ত্রে পরলোক তত্ত্ব (থিওসফি)’ প্রবন্ধটি পাঠ করে জনৈক পাঠক যে সব সমালোচনা করছেন (২১ জুলাই) তাতে প্রথমেই দুটি বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এক, থিওসফি আর পরলোকতত্ত্ব কি সমার্থক, এই দুটি বিষয় চর্চাকারীদের উদ্দেশ্য কি এক?

উত্তরে জানাই, ধর্মের ইংরাজি প্রতিশব্দ রিলিজিয়ন বহুল ব্যবহৃত। যদিও ধর্ম অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়, তবুও জনসমাজে প্রচলিত কোনো শব্দ ব্যবহার না করে হঠাৎ অন্য কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে তার কারণ দর্শাতে গিয়েই প্রবন্ধের কলেবর বৃহৎ হয়ে যাবে। তাই ধর্মের প্রতিশব্দ রিলিজিয়ন যেমন ব্যবহার করি, তেমনই ভাবে পরলোকতত্ত্বের প্রতিশব্দও থিওসফি ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু পরলোকচর্চাকারীরা অবশ্যই মহত্তর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, থিওসফি বিষয়টি কি তা নাকি আমি আমার প্রবন্ধে কোথাও স্পষ্ট ভাবে বলিনি।

এর জবাবে জানাই যে প্রবন্ধটির প্রথম কলামের শেষ নয়টি লাইনে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে যে পরলোকতত্ত্ব বা থিওসফি বিষয়টিতে দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য সাধনা, আমাদের স্থূল ভৌতিক সীমার বাইরে বসবাস করা আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করা হয়। স্বস্তিকার বয়োবৃদ্ধ পাঠক ও সমালোচক শ্রী ঘোষ কোনো কারণে লাইনগুলি হয়তো ‘মিস’ করে গেছেন।

তারপর আর একটি অভিযোগে সমালোচক বলেছেন যে লেখকের বক্তব্য সবই হাইপোথিটিক্যাল, হিন্দু শাস্ত্রের কোথাও এগুলি আছে তার উল্লেখ নেই। এর উত্তরে জানাই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পর্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের বড়দা নলিন পণ্ডিতের কন্যার সন্তান ছিলেন চৈতন্য ভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস। তস্য পুত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন মহাপ্রভুর উপর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা।

এই প্রবন্ধকার হলেন শ্রীবাস পণ্ডিত, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজদের বংশের সন্তান। সুতরাং আমি নিজে এবং বহু পুরাতন বংশ পরম্পরা ধরে আমার পরিবার এই দিব্য যোগ, দেব দেবী ও প্রেতদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, আয়ুর্বেদ, সাহিত্য ও সমাজসেবার নিবিড় অনুশীলন করে আসছি। তাই এই প্রবন্ধে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কথাই বেশি দেওয়া আছে। আমরা গুহ্যবিদ্যা চর্চায় পারদর্শী ছিলাম বলেই বংশের উপাধি পরিবর্তন করে পণ্ডিত থেকে সেন গুপ্ত হিসাবে ডাকতে শুরু করে তৎকালীন সমাজপতিরা। আর বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বহু স্থানেই দিব্যদৃষ্টি, দেবদেবী, প্রেত ইত্যাদির কথা আছে। তাই আলাদা করে বিশেষ কোনো শ্লোক ব্যবহার করিনি।

শেষ অভিযোগ, বিবেকানন্দ বনাম থিওসফিক্যাল সোসাইটির আচরণ বিষয়ে। পত্রকার শুধু বিবেকানন্দের এ ব্যাপারে তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে সবাইকে মাপতে চেয়েছেন। আর সব সোসাইটির মতো থিওসপিক্যাল সোসাইটিতেও ভালমন্দ দিক থাকবে। সোসাইটির সবাই উন্মাদ আর বাজে হলে তাদের শিকাগো ধর্মসম্মেলনে ডাকা হলো কেন? বিবেকানন্দ বহু বিষয়েই পরবর্তীকালে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাই বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার নিরিখে গোটা বিষটিকে হেয় আমি করতে চাহিনি। কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পরলোকতত্ত্ব চর্চা করতেন, করতেন আরো বহু মনীষী।

—**রবীন সেনগুপ্ত,**
বহরমপুর।

একটি বোকা প্রশ্ন

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট গণপরিষদের রাতের অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত ভাষণে বলেছিলেন— ‘আজ মধ্যরাত্রিতে যখন সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময় ভারত ঘুম থেকে উঠে...’, (“At the stroke of the midnight hour, when the other world sleeps, India will awoke to life and freedom...”)। তা কি করে হয়? সূর্য পূর্বাকাশে উদয় হয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। ফলে, ভারতে যখন মধ্যরাত্রি, তখন পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও প্রভাতকাল, কোথাও অপরাহ্ণ বা মধ্যাহ্নকাল। তাই, ভারতে যখন মধ্যরাত্রি, সে সময় পৃথিবীর অন্যত্র আর সবার তো জেগে থাকার কথা।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

গণেশ—তত্ত্বে ও তথ্যে

নবকুমার ভট্টাচার্য

গণেশ শিবপার্বতীর পুত্র। গণেশের বহু নাম— গণপতি, শক্তিগণপতি, বিদ্যাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, বিরিগণপতি, বিনায়ক, লক্ষ্মীবিনায়ক, গজানন, লম্বোদর, মহোদর, বিঘ্নরাজ, বিকট, হেরম্ব, একদন্ত এবং বক্রতুণ্ড। মূর্তি অনুসারে গণেশ পুজোর প্রকারভেদ লক্ষণীয়। যে কোনো পুজোর আগে গণেশের পুজো বাধ্যতামূলক। এছাড়া যে কোনো শুভকাজে, ব্যবসার ক্ষেত্রে নববর্ষে সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশের পুজো প্রচলিত। ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী হলো গণেশ চতুর্থী। গণেশের জন্ম নিয়ে পুরাণে বহু কাহিনী রয়েছে। গণেশের মাথা খসে গিয়ে সেখানে গজের মাথা স্থাপনের ঘটনাটি নিয়েও পুরাণে নানা কাহিনী প্রচলিত। এর মধ্যে সব থেকে প্রচলিত কাহিনীটি হলো, গণেশের জন্ম হলে সব দেবতার সঙ্গে শনিও তাকে দেখতে আসেন। কিন্তু শনি দেখতে এসেও গণেশের দিকে তাকান না। কারণ শনির স্ত্রীর অভিশাপ ছিল শনি যেদিকে তাকাবেন সব পুড়ে যাবে। কিন্তু পার্বতী একথা জেনেও শনিকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তাঁর পুত্রসন্তানকে দেখার জন্য। শনি পার্বতীর পুত্রের দিকে যেই তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা খসে যায়। এই খবর পেয়ে বিষ্ণু ছুটে আসেন এবং পথে একটি ঘুমন্ত হাতির মাথা সুদর্শনে কেটে এনে শিশুটির দেহে জুড়ে দেন। গণেশের মাথা খসে পড়ার ব্যাপারটি বাংলা প্রবাদের মধ্যেও স্থান পেয়েছে— 'শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খসে পড়ে।'

ঋক্‌বেদে গণপতির উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্‌বেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বরাহ পুরাণ, শিবপুরাণ, মনুসংহিতা, সুভাষিত রত্নভাণ্ডার, সুভাষিতাবলি, তন্ত্র প্রভৃতি বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ স্তর পেরিয়ে গণেশ মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে নিজের স্থানটি দখল করে নিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত, রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল— পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য আখ্যানকাব্যের 'বন্দনা' অংশে গণেশের অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষণীয়। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যগুলির বন্দনা অংশে গণেশের যে স্তুতি এবং রূপের পরিচয় মেলে তা মূলত সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নেওয়া।

ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতিকে গণপতি বলা হয়েছে। আবার ইন্দ্রও গণপতি রূপে উল্লেখিত। ঋগ্‌বেদেই মরুৎগণ রুদ্রের 'গণ' রূপে পরিচিত। এই গণদের যিনি পরিচালক তিনিই গণপতি। সে অর্থে রুদ্রও গণপতি। মনুসংহিতায় গণেশকে শূদ্রদের দেবতা বলা হয়েছে। বরাহপুরাণের ২৩ অধ্যায়ে রয়েছে, শিবমুখ থেকে উৎপন্ন অপূর্বসুন্দর কুমার পার্বতী ও অন্যান্য দেবদেবীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিবের শাপে ওই কুমার হস্তিমুখ হন। পরে শিব তাঁকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং গণেশ নাম দেন। শিবপুরাণের 'রুদ্রসংহিতার' অন্তর্গত কুমার খণ্ডের বর্ণনা অনুসারে, পার্বতীর গাত্রমল থেকে সৃষ্ট গণেশ পার্বতীর স্নানগৃহের দ্বারপাল নিযুক্ত হন। তিনি শিব ও তাঁর অনুচরদের ওই গৃহে প্রবেশে বাধা দেন। এতে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মহাদেব ক্রোধে দুর্জয় গণেশের শিরশ্ছেদ করেন। গজমুণ্ড সংযোগে শিবই আবার গণেশকে বাঁচিয়ে তোলেন। পার্বতী যুদ্ধ সমাপ্তির ব্যবস্থা করেন এবং শিবের অনুগ্রহে গণেশ সব দেবতার আগে পুজো পাওয়ার অধিকারী হন। বরাহপুরাণ মতে, শিবপার্বতীর পুত্ররূপে গণেশের জন্মের পর বিভিন্ন দেবতা গণেশকে নানা উপহার দেন। গণেশকে সরস্বতী দেন কলম, ব্রহ্মা জপমালা, ইন্দ্র গজদন্ত, শিব ব্র্যাঘ্রচর্ম, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র এবং পৃথিবী মূষিকবাহন। গণেশের একদন্ত হওয়ার বিবরণ রয়েছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণপতি খণ্ডে। গণেশ একসময় হরপার্বতীর দর্শনার্থী পরশুরামকে ঘরে ঢুকতে দেননি, ফলে পরশুরামের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায়।

শাস্ত্র বলেছে 'জ্ঞানং গণেশাং'। যেদিন থেকে মানুষের জ্ঞানের উদয়, মানুষ বুদ্ধির ব্যবহার করতে শিখেছে, পঞ্চজন একত্রে 'গণে' দলবদ্ধ হয়েছে সেদিন থেকেই গাণপত্য সংস্কৃতির সৃষ্টি বা উদ্ভব। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে অথবা বাঙালির সাধনায় গণেশের প্রভাব পড়েছে। গণেশ বুদ্ধিজীবী। দু' হাতে লিখতে পারেন। বেদব্যাসের মহাভারত রচনায় শ্রুতিলেখক হিসেবে তাঁর দক্ষতা স্মরণীয়। কালে কালে ভারতীয় বাণিজ্য ও ব্যবসার দেবতা হিসেবে গণেশ তাঁর আসন পাকা করে নিয়েছেন।

মহানির্বাণতন্ত্রে গণেশের একটি নাম 'রক্ততুণ্ড'। রক্ত গণেশের

স্বাভাবিক ধর্ম। আর এই রক্তবর্ণের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত রয়েছে— ধন দেবে, প্রাণ পর্যন্ত দেবে কিন্তু গুহ্যশাস্ত্র কখনই প্রকাশ করবে না। মহানির্বাণতন্ত্রে দেখা যায়, আদ্যা শক্তি পার্বতী যখন শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, শিব ব্যতীত আর কে গূঢ়তত্ত্ব সমূহ জ্ঞাত আছেন, তখন শিব গণেশের নাম করেছিলেন। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সাধকের প্রত্যহ প্রথম কর্ম হলো 'চৌরগণেশ' মন্ত্র জপ। এই মন্ত্র জপ না করলে 'চৌরগণেশ' দিনের সমস্ত কর্মের ফল হরণ করেন। তন্ত্রে রয়েছে উচ্ছিষ্ট গণেশ, হরিদ্রাগণেশ। অভিনব গুপ্ত রচিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে মহাগণেশের উল্লেখ রয়েছে। কাশ্মীর রাজ্যে এই মহাগণেশের পুজো প্রচলিত। কাশীখণ্ডে ঢুন্টি বিনায়কের উল্লেখ রয়েছে। কাশী প্রবেশে প্রথমেই এই দেবতার পুজো করতে হয়।

গণেশ পুজো কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সব সম্প্রদায়ের মানুষই গণেশকে সিদ্ধিদাতা রূপে মানেন। গণেশ পুজো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত না হলেও 'গণেশ সম্প্রদায়' নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব মহারাষ্ট্রে ছিল। তারা ব্রহ্মাকে গণেশ এবং পরব্রহ্মাকে গণপতি বলে মানেন। কিন্তু গণেশ পুজোর যে জনপ্রিয় সর্বজনীন রূপটি এখন চোখে পড়ে বিশেষ করে ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীতে তার প্রচলন করেন বালগঙ্গাধর তিলক। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখিবন্ধন উৎসবের পূর্বেই লোকমান্য তিলক পুণা ও পরে সমগ্র মহারাষ্ট্রে সর্বজনীন গণেশ পুজোর প্রচলন করেন এবং তার মাধ্যমে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করেন।

শোনা যায়, ১৮৯৩ সালে প্রথম সর্বজনীন গণেশ পুজো হয় পুণায় ওয়ার্ধার পেট শালুক লেনে শ্রীভবরঙ্গাবীর বাড়িতে। ওই পুজোর প্রশংসা করে মহামান্য তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরের বছর নিজের বাড়িতে ও অন্যান্য স্থানে গণেশপুজো আরম্ভ করেন এবং তার মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করেন। ■

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন

বামনাবতার

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামন। এই অবতারে তিনি দৈত্যরাজ বলিকে বধ করেন। দশাবতার স্তোত্রে কান্তকবি জয়দেব বলেছেন—

"ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামনঃ
পদনখনীরজনিত জনপাবন।
কেশব ধৃত বামনরূপ, জয় জগদীশহরে।।"

ইনি পদক্ষেপ দ্বারা দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করে রসাতলে পাঠিয়েছিলেন। এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি লক্ষ্য করলে দেখবো এই সময় বামনাবতারের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে; কিন্তু সেই উচ্চভাব সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

আমরা জানি প্রহ্লাদ ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েই রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধরে প্রহ্লাদের সেবক রূপে তার কাছে বসবাস করতে লাগলেন। প্রহ্লাদ কিছুই বুঝতে পারেননি। দীর্ঘ বারো বছর তার সেবায় তুষ্ট হয়ে প্রহ্লাদ তাঁকে বর দিতে চাইলে সেই ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁর শীল (গুণগুলি) প্রার্থনা করলেন। প্রহ্লাদ দিতে বাধ্য হলেন। এই শীল আর কিছুই নয় দৈত্যদের রাজ্য পরিচালন পদ্ধতি। প্রহ্লাদ এইভাবে শীলহীন হয়ে পড়লে ইন্দ্র প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় না গিয়েও প্রহ্লাদের রাজ্য অধিকার করে নিলেন। আগেই বলেছি (দ্র. নৃসিংহাবতার) বুদ্ধিমত্তা ও রাষ্ট্রভক্তির সাহায্যে বিদেশীদের হীনবল করে এদেশ থেকে বহিষ্কার করার এক চেষ্টা হয়েছিল যা বামন অবতারে সাফল্যলাভ করে। প্রহ্লাদ যতই বিষ্ণুভক্ত হোক না কেন, আদতে সে তো দৈত্য) সে তো বিদেশী। সুতরাং ছলে-বলে-কৌশলে বিদেশীদের হাত থেকে দেশকে তো উদ্ধার করতেই হবে। সে যুগে ভারতবাসীরা তারই আন্তরিক চেষ্টা করেছিল।

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। বলি তপস্যাবলে অজয় ও অমর হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের অধীশ্বর হয়ে বসল। ইন্দ্রাদি দেবতাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে দৈত্যরাজ বলি ত্রিভুবনের রাজা হলেন। এই বলির হাত থেকে পৃথিবী উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু বামন অবতার ধারণ করেন। বলি ত্রিভুবন জয় করে চারিদিকে যজ্ঞ করে বেড়াতে লাগলো। এই ভাবে সে জনচিত্তে শ্রদ্ধা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা সঞ্চার করলো। জনমানসে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, বলি একমাত্র মান্য লোক, সততাই তাঁর আশ্রয়স্থল। তাঁর কাছে যে কেউ দুঃখ নিবেদন করলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তা নিবারণ করেন। এইভাবে বলি জনসাধারণের হৃদয় সিংহাসনে বসলো। ইন্দ্র প্রমাদ গুনলেন। শত্রুরাজা যদি প্রজাবৎসল হয় তবে তাকে উৎখাত করা কঠিন। ইন্দ্রও নাছোড়বান্দা। বিদেশী রাজাকে উৎখাত করতেই হবে।

বলির রাজ্যে জনসাধারণ সুখেই বাস করছিল। তার রাজ্য সু-রাজ্য ছিল, কিন্তু স্বরাজ্য ছিল না। বলির শাসনের সঙ্গে বৃটিশ শাসনের তুলনা করা যায়। বৃটিশ রাজত্বে ভারতীয়রা সুখে ছিল, কিন্তু স্বস্তিতে ছিল না। কারণ শাসক ছিল বিদেশী। বলির সময়েও সেই অবস্থা ছিল। ইন্দ্র সেই সুযোগ গ্রহণ

করলেন। শাসনকালের সমস্ত প্রধান পদে বলি বিদেশী দৈত্য ও অসুরদের নিয়োগ করেছিল। বিষয়টি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ফলে ভারতীয়দের পক্ষে আপন কর্তৃত্ব প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। সে যুগের ভাবুক সমাজ অনুভব করলো এই অবস্থা চলতে থাকলে এদেশের মানুষ নিম্নস্তরে নেমে যাবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বিনষ্ট হবে। ভারতের জাতিসত্তা বিলুপ্ত হবে। ধীরে ধীরে এই ধারণা জনমনে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে লাগলো। দেবরাজ ইন্দ্র সেই আগুনে বাতাস দিতে লাগলেন। কিন্তু এই রোষাগ্নিকে কাজে লাগাবে কে? পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা বলির কাছ থেকে যথেচ্ছ দক্ষিণা পেয়ে খুব খুশি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের উপর বলির তীব্র দৃষ্টি। একটু বিদ্রোহের আভাস পেলেই তাদের বধ করছে। আর সাধারণ মানুষ স্বার্থপর, তাদের লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বলি দাবিয়ে রেখেছে। জনরোষ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালো যে নারীরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দেবমাতা অদিতি এই শাসনব্যবস্থা উচ্ছন্নে যাবার সংকল্প করে তপস্যায় বসলেন একটি সুপুত্র কামনায়। তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হলেন বামন-অবতার রূপে স্বয়ং বিষ্ণু! শিশুকাল থেকে বামন যেমন সাহসী, তেমন উদ্যমী। বামন অর্থাৎ বেঁটে। এটিও একটি প্রতীক। বেঁটে লোকের বুদ্ধি প্রখর। এর বস্তুর প্রয়োজন স্বল্প। বলির রাজত্বে সুকৌশলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হলো। ব্রাহ্মণরা পঠন পাঠন করেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের হাতে দেশরক্ষা ও বাণিজ্যের ভারও নেই। সবকিছুর দায়িত্ব দৈত্য ও অসুরদের উপর ন্যস্ত। বামন পুনরায় বর্ণাশ্রম প্রথা ফিরিয়ে আনার কথা বলতে লাগল। জনসাধারণ বামনকে বিপুল সমর্থন দিল। বলি বামনকে প্রভূত ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারলো না। বামনের আন্দোলন দিন দিন শক্তিশালী হতে লাগল। বলি বামনের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চাইল। গুরু শুক্রাচার্য বাধ সাধলেন। তিনি স্বপক্ষনিষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি একচক্ষু বিশিষ্ট। তিনি বলিকে বামনের আন্দোলন ধ্বংস করতে পরামর্শ দিলেন, বলি রাজি হলেন না। ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য বলিকে রাজ্যভ্রষ্ট হবার অভিশাপ দিলেন। তবু বলি শুক্রাচার্যের কথা শুনলো না। আপসের কথাবার্তা শুরু করলেন।

বামনের দাবি ছিল তিন বর্ণের লোককে নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কাজ করতে দিতে হবে। তাই তিনি বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চেয়েছিলেন। এতে বলির আপত্তি ছিল না। বামনের প্রথম দাবি, বলিকে যজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। বিরোচন ও শুক্রাচার্যের শিক্ষাপদ্ধতি রাজ সমর্থন পাবে না। দ্বিতীয় দাবি, রাজকার্যে ও সেনাবাহিনীতে ক্ষত্রিয়দের নিযুক্ত করতে হবে। আর তৃতীয় দাবি ভারতীয় বৈশ্যদের উপর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। বলি প্রথম দাবি মেনে নেন, পরে দ্বিতীয় দাবি মেনে নেন, কিন্তু বলির অমাত্যবর্গ এই দ্বিতীয় দাবি মানতে চায়নি। তখন বামনের সৈন্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেঁধে যায়। বলি কঠোরভাবে সেই যুদ্ধ বন্ধ করেন। দৈত্য ও অসুররা পিছিয়ে আসে। কিন্তু তৃতীয় দাবি মানতে বলি ইতস্তত করতে লাগলেন। কারণ ভারতীয় বৈশ্যদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে অসুর বণিকরা বাণিজ্যে টিকে থাকতে পারবে না। তারা পিছিয়ে পড়বে। ফলে বলির রাজত্বের মূল ভিত্তিটাই ভেস্তে যাবে। এই সময়ে বলির চোখ খুলে যায়, তিনি প্রতিকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। দুই অধিকারের বলে বলীয়ান হয়ে বামন বলিকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং যাতে পালাতে না পারে তার জন্য বরুণপাশে বদ্ধ করলেন। তাই প্রচলিত আছে বামন তাঁর তৃতীয়পদ বলির মস্তকে স্থাপন করেন।

এরপর বামন বলিকে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করার জন্য প্রেরণ করেন। আধুনিক পরিভাষায় বলিকে রাজবন্দী হিসেবে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার সঙ্গে রাখা হয়েছিল। বামনের এই কাজ জাতীয়তাবোধ ব্যতীত সম্ভব ছিল না। বামন সম্পূর্ণ ধ্যেয়নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁর মনে স্বার্থভাবনা ক্ষণকালের জন্যও স্থান পায়নি। এই ঘটনার পর তাঁকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ করে জনসাধারণ ব্যর্থ হন। বলিকে পর্যুদস্ত করে বামন দেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব আদর্শ উপস্থাপিত করেন। বামন স্বর্গলোকে দ্বিতীয় পদ স্থাপনের পর ব্রহ্মা নিজ কমণ্ডলুর জল দিয়ে তাঁর পদ ধুইয়ে দেন। ওই পবিত্র পদের ধৌত ধারাই পরম পবিত্র গঙ্গানদী।

বামনের এই কাজ শুধু বলির শাসন (বিদেশী শাসন) থেকেই যে ভারতবর্ষকে মুক্তি দিয়েছিল তা নয়; বিদেশী আক্রমণও বন্ধ হয়ে সীমান্ত সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। এই বায়ব্য দিশা (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত) যেদিক থেকে ভারত আক্রান্ত হোত তা সুরক্ষিত হলো। এই কাজের ফলে জনসাধারণ এতই তৃপ্ত হয়েছিল যে, 'বামন-জয়ন্তী' পালন করতে লাগল। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে দৈন্য, দাস্যভাব ও নিরাশার অন্ধকার দূরীভূত হয়— এই কথা প্রকাশ করার জন্যই জনসাধারণ কয়েকদিন ধরে ঘরে ঘরে দীপ জ্বেলে উৎসব পালন করে, যা আজও 'দীপাবলি' নামে পরিচিত। বিজয়াদশমী আমাদের বিজয়োৎসব, আর দীপাবলি আমাদের স্বাধীনতা উৎসব। আজ এই উৎসবের তাৎপর্য আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা থাকলেও বিদেশীর প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত নয়— ভারতীয়দের এই সাত্ত্বিক চিন্তা থেকেই বলির সুশাসনের স্মরণে 'বলি-প্রতিপদ' উৎসব পালন করা হয়।

ন্যায় ও নীতি রক্ষা করে স্বাভিমানী জীবন যাপন করাই মনুষ্যত্ব। এটি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। এই মনুষ্যত্ব যা জাতীয়তার নামান্তর এই পাঁচ অবতারের মধ্যে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ে জাতীয়তাবোধ সকলের মধ্যে জাগ্রত হলেও পূর্ণমাত্রায় হয়নি। এই জাতীয়তাবোধকে যদি আমরা মানুষ হিসাবে ভাবি তাহলে বলা যায় এর গভীরতা বেশি ছিল না। মৎস্য থেকে বামন পর্যন্ত অবতারের কালে জনগণের মনে জাতীয়তার ধারণা অবশ্যই ছিল কিন্তু তেমন ছিল না। জাতীয়তাবোধের ব্যাপক প্রচার ও প্রয়োগ আমরা প্রথম দেখলাম বামন অবতারের সময়। যার ফলে বলিরাজের সুবিন্যস্ত শাসনপ্রণালীও অকেজো হয়ে গেল। তবে এই জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট প্রকাশ ও উচ্চভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাই এই অবতারের নাম 'বামন' (বেঁটে)। বলির যজ্ঞমণ্ডলে বামন অতি বিশাল রূপ ধারণ করে কিছু পরেই পুনরায় সৌম্য রূপ ধারণ করেন। এই অদ্ভুত বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুরাণকার এই ঐতিহাসিক ঘটনারই সঙ্কেত দিয়েছেন। ■

চিরদিনের গল্প নিয়ে নাটক

গান গাওয়া পাখি

কৌশিক গুহ

জন্মদিনে আর্যকে মা দিয়েছিল খুব পছন্দের একটা বই। হ্যানস আন্দেরসন-এর লেখা গল্পের বই। অনেক গল্প পড়েছে বারবার। শুনেছে ছোটোবেলায়। তার প্রিয় লেখকদের একজন হ্যানস আন্দেরসন। ডেনমার্কে জন্ম। ১৮০৫ সালের ২ এপ্রিল। মৃত্যু ১৮৭৫-এর ৪ আগস্ট। তাঁর জন্মের পর ২০৯ বছর পেরিয়েছে। এখনও তাঁর গল্পের আকর্ষণ পুরনো হয়নি। রূপকথার যাদুকর তিনি।

ছোটোদের জন্যে যত্ন করে কত গল্প লিখে গেছেন। আমাদের দেশে যাঁরা ছোটোদের জন্যে লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই পড়েছেন হ্যানস আন্দেরসন-এর গল্প। আর্যকে জিগগেস করেছিল অয়নাংশু, 'ছোটোদের জন্যে নাটক লিখতে হবে একটা। কার গল্প নেওয়া যায় বলো তো?' আর্য এগিয়ে দিয়েছিল হ্যানস অন্দেরসনের বইটা। বলেছিল, 'পড়ে দেখো। পছন্দের গল্প খুঁজে পাবে। ঠিকমতো নাট্যরূপ দিলে জমে যাবে।' দু'দিন ধরে বইটা পড়ল অয়নাংশু। একটার পর একটা গল্প। কোন কোন গল্প দু'তিনবার পড়েছে। পড়া শেষ হবার পর খুশিতে ফোন করে জানাল আর্যকে, 'গল্প বেছে নিয়েছি।' আর্য বলল, 'জমিয়ে নাট্যরূপ দাও।' কোন গল্প জানতে চাইল না আর্য। সে চাইছিল অয়নাংশু লিখে ফেলুক আগে।

অফিসকে জরুরি কাজ আছে বলে দশদিন ছুটি নিলো অয়নাংশু। কোথাও যাওয়া নেই। সব ভুলে গল্পটার নাট্যরূপ দেওয়ার কথা ভাবতে লাগল। ছোটোদের নিয়ে নাটক হবে দেড় ঘণ্টার। দশদিনের ছুটি শেষ হবার আগেই লেখা হয়ে গেল নাটক। অয়নাংশু উৎসাহের চোটে নাটকটা নিয়ে চলে গেল তার নাটকের স্যার শঙ্করীপ্রসাদের কাছে। শোনাল নাটকটা। স্যার একটু-আধটু অদল-বদলের পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'দারুণ হয়েছে। জমে যাবে।' নাটকের অনেকগুলো ফোটো কপি করা হলো রিহারসালের জন্যে।

অয়নাংশু বেছে নিয়েছিল 'নাইটেঙ্গল' গল্পটা। সে নাম দিয়েছে পাখি। গান গাওয়া পাখির গল্প। চীন দেশের এক রাজা খুব ভালোবাসেন গান। রাজা বলে নিজে গাইতে পারেন না। কিন্তু শুনতে ভালোবাসেন। রাজা গান পছন্দ করেন। রাজ্যের এক গরিব কিশোরী তাঁকে উপহার দিলো একটি পাখি। বলল, 'এ পাখি আপনাকে আনন্দ দেবে। ভালো রাখবে। আপনি ভালো থাকলে রাজ্যের ভালো হবে।' রাজাকে আরও বলল মেয়েটি, 'এই পাখি রাতে গান গায়। দিনে গাইতে পারে না।' সন্ধে নামছিল। পাখি গেয়ে উঠল। রাজা চমকে গেলেন। এমন গান তিনি কখনও শোনেননি। তিনি কিশোরীকে পুরস্কার দিতে চাইলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেলেন না তাকে। পাখির জন্যে সোনার খাঁচা এলো। কতরকমভাবে যত্নের ব্যবস্থা। রাজাকে গান শোনানো পাখির কাজ হলো। পাখির গান শুনে সকলেরই মন ভরে যাচ্ছে। জাপানের হিংসুটে রাজা শুনে ভাবলেন একটা গান গাওয়া পাখি তৈরি করে চীনের রাজাকে দেওয়ার কথা। বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন। ঘটা করে উপহার দেওয়া হলো চীনের রাজাকে। বলা হলো, 'দেখুন যাচাই করে কে ভালো গায় আপনার পাখি, না এই পাখি।' দিনের বেলা, যন্ত্রের পাখি গাইল। সুন্দর গাইল। রাজা তাঁর প্রিয় পাখিকে বললেন, 'গাও।' সে চুপ করে রইল। দিনেরবেলা সে তো গান গাইতে পারে না। রাজা রেগে গিয়ে নিজের পাখিকে বিদায় করে দিয়ে যন্ত্রের পাখিকে নিয়ে মেতে উঠলেন। কিছুদিন বাদে যন্ত্রের পাখি চুপ করে গেল। গান বেরোয় না। জাপানে খবর গেল। যন্ত্রবিদরা কিছু করতে পারল না। গান শুনতে না পেরে রাজা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর বাঁচার আশা নেই। যমদূতরা এসে গেল নিয়ে যাবার জন্যে। সন্ধ্যে নামলেই নিয়ে যাবে। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো পাখি গান গেয়ে উঠল। রাজা আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। তারপর উঠে বসলেন। যমদূতরাও অমন গান কখনও শোনেনি। পাখি চাইল যমদূতের কাছে রাজার প্রাণভিক্ষে। যমদূতরা চলে গেল। পাখি গাইতে লাগল। রাজা মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সব পোশাক পরলেন। সকলে ঘরে ঢুকে দেখল রাজাকে। পাখি তখনও গান গেয়ে চলেছে।

নাটক জমিয়ে দিল ছোটোরা অভিনয় করে। আর্য নাটক দেখার পর গ্রিনরুমে এসে জড়িয়ে ধরল অয়নাংশুকে। বলল, 'চমৎকার হয়েছে। যেমনটা আশা করেছিলাম ঠিক তেমনি।' অয়নাংশু একটা প্যাকেট দিল আর্যকে। আর্য বলল, 'এটা কি?' অয়নাংশু বলল, 'তোমার দেওয়া বইটা।' আর্য অনেক ছবি তুলেছিল। আরেকটা ছবি তুলল অয়নাংশুর।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

ভালো বই সবদেশের, সবকালের

ভালো বই-এর কোনো দেশ নেই, কাল নেই। তা সবদেশের, সবকালের। লেখকের জন্ম যে দেশেই হোক তাঁর সৃষ্টি কোনো দেশের গণ্ডীতে

আটকে থাকে না। খোলা আকাশে পাখি যেভাবে ওড়ে ঠিক সেরকম। বাতাসে ভেসে যায় সীমা পেরিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আমরা নিজেদের সুবিধের জন্যে সীমানা তৈরি করেছি। আর তা মেনে নিয়ে শান্তি কল্যাণ বজায় রাখি। মাঝে মাঝে সীমানা নিয়ে এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির ঝগড়া হয়। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের লড়াই বেঁধে যায়। আরও কতরকম গোলমাল। তা সহজে থামে না। অল্প সময়ের জন্যে ঝগড়া বন্ধ থাকলেও যে কোনো সময় আবার শুরু হয়ে যায়। তাতে ক্ষতি হয় অনেক। যুদ্ধে কোথাও কারো ভালো হয় না। পাশাপাশি দেখো প্রকৃতি কত সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রেখেছে কত কিছু। সীমানা ছাড়িয়ে তার আকর্ষণ। এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায় সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য। এক দেশের ছোটোরা যে গল্প শুনে আনন্দ পায় সেই গল্প আনন্দ দেয় একইভাবে অন্য দেশের শিশু কিশোরদের। যা ছোটোদের ভালো লাগে তা মন অধিকার করে বড়োদেরও। আসলে বড়োরাও একসময় ছোটো ছিল! আর বড়োদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে শিশুমন। সেই মন মেঘের সঙ্গী হয়ে কল্পনার পাখায় ডানা মেলে উড়তে চায়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে। ছোটোরা যখন ভালো বইয়ের খোঁজ পায় তারা মেতে ওঠে। বড়োরা যদি এদিকে লক্ষ্য রাখেন তাহলে মজা পাবেন তাঁরাও।

বইমিত্র

চিরদিনের পাঠ

বিদূষক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঞ্চির রাজা কর্নাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনা-মানিকে হাতি বোঝাই হলো।

দেশে ফেরবার পথে বালেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পুজো দিলেন।

পুজো দিয়ে চলে আসছেন— গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে

রক্তচন্দনের তিলক, সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

এক জায়গায় দেখলেন, পথের ধারে আম বাগানে ছেলেরা খেলা করছে।

রাজা তাঁর দুই সঙ্গীকে বললেন, 'দেখে আসি, ওরা কী খেলছে।'

২.

ছেলেরা দুই সারে পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?'

তারা বললে, 'কর্নাটের সঙ্গে কাঞ্চির।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জিত, কার হার?'

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বললে, 'কর্নাটের জিত, কাঞ্চির হার।'

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হলো, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা করে হেসে উঠল।

৩.

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেলছে।

রাজা হুকুম করলেন, 'এক একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো আর লাগাও বেত!'

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বললে, 'ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ করো।'

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে। কাঞ্চির রাজাকে কোনো দিন যেন ভুলতে না পারে।'

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪.

সন্ধেবেলায় সেনাপতি রাজার সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বললে, 'মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখশব্দ শুনতে পাবেন না।'

মন্ত্রী বললে, 'মহারাজের মান রক্ষা হলো।'

পুরোহিত বললে, 'বিশ্বেশ্বরী মহারাজার সহায়।'

বিদূষক বললে, 'মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।'

রাজা বললেন, 'কেন।'

বিদূষক বললে, 'আমি মারতেও পারিনে, কাটতেও পারিনে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।' ■

অঙ্গনা

মাতৃপ্রতিম মা

শুভশ্রী দাস

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দানের পরম্পরা অতি প্রাচীন। সমাজে যে কোনো দানকেই উচ্চ দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইদানীং আরো একটি দান শুরু হয়েছে। সন্তানদান। এই দাতারা হচ্ছেন মাতৃপ্রতিম মা। ইংরেজিতে 'সারোগেট মাদার' বলা হয়। এর অর্থ হলো কোনো দম্পতির ভ্রূণকে যিনি নিজের গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসবের পর সন্তান সেই দম্পতিকে সমর্পণ করেন।

এই প্রক্রিয়া যদি এখানেই সীমিত থাকতো তবে এর থেকে শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু হোত না। কিন্তু যেখানে লেনদেন ও টাকাপয়সার কথা আসে সেখানে দান না হয়ে ব্যবসা করা হয়ে যায়। আজ সারোগেসি রূপে সমাজে এর ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। সারোগেট মাদাররা অর্থের বিনিময়ে গর্ভ ভাড়া দিচ্ছেন।

স্বামী-স্ত্রীর প্রাকৃতিক সম্পর্কের ফলে উৎপন্ন সন্তানের সামাজিক মান্যতা থাকে। কিন্তু কিছু ত্রুটির জন্য কোনো কোনো দম্পতি সন্তানবিহীন থাকেন। অতি আধুনিকতার নামে কোনো কোনো মহিলা (রূপ নষ্ট হওয়ার ভয়ে) সন্তান ধারণ করতে চান না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির কারণে আজকাল অনেক এরকম পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে যা স্বামী-স্ত্রীর ত্রুটি দূর করে তাদের সন্তানসুখ দিতে পারে। আবার একেবারেই সন্তান না হলে অনাথশিশু দত্তক নেওয়া যেতে পারে। দেশে অনেক অনাথ আশ্রম আছে, সেখান থেকে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো শিশুকে দত্তক নিয়ে তার বাবা-মা হওয়া যেতে পারে।

এসবের থেকে আলাদা একটি পদ্ধতি সারোগেসি। সন্তানেচ্ছু দম্পতির শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পরীক্ষাগারে নিষিক্ত করে তা সারোগেট মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়। সারোগেট মা ন'মাস পর্যন্ত এই ভ্রূণ নিজের গর্ভে ধারণ করে সন্তান জন্মের পর ভ্রূণের মালিক দম্পতিকে দিয়ে দিতে হবে। এটাই সারোগেসির সাধারণ প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন উঠতে পারে সারোগেসি কেন? এর কারণ হলো আজও নিজের অংশ থেকে উৎপন্ন সন্তানের আনন্দ ও মর্যাদাই আলাদা। অনাথ শিশু দত্তক নেওয়ার চেয়ে সারোগেসি থেকে উৎপন্ন সন্তান একেবারে আপনার মনে হয়। কারণ এতে মা-বাবা দুজনেরই সমান অংশ থাকে। সারোগেসির এই ভাবাত্মক দিকটি শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশেও সমানভাবে আদৃত। একথাও প্রমাণিত যে, সারোগেসি পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়ার জন্য ভারতে আসছে অধিকাধিক বিদেশী দম্পতি।

এর ভাবাত্মক দিকটি উপেক্ষা করে এখন টাকাপয়সা দিকটা বড় করে দেখা হচ্ছে। আইন ব্যবস্থা কি একে ব্যবসার সংজ্ঞা দিয়েছে? প্রথমে জানা প্রয়োজন সারোগেসি বৈধ মান্যতা পেয়েছে। এক কথায় এটি নিঃসন্তান দম্পতি ও সারেগেট মাদারের মধ্যে এটা একটা আইনি চুক্তি। টাকাপয়সার বিষয়ে চুক্তিতে স্পষ্ট বিবরণ দিতে হয়। এখন সারোগেট মাদারকে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা দিতে হয়। অপ্রিয় সত্য হলো, এই ব্যবসায় বছরে প্রায় ৮৫ কোটি ডলার লেনদেন হচ্ছে। ২০২০ সালে ১০০ কোটি ডলারে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিদেশী দম্পতিদের এজন্য ভারতে আসার কারণ ভারতে সারোগেট মাদারকে দিতে হয় প্রায় ছ' লক্ষ টাকা। আমেরিকাতে এর খরচ ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ ছয়গুণ কম খরচে ভারতে সন্তান পাওয়া যায়।

এখন সারোগেট মাদার অর্থাৎ গর্ভ ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রধানত গরিব মায়েরাই এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এদের শোষণ করাও কম হচ্ছে না। নিঃসন্তান দম্পতি বিদেশী হলে শিশুর অধিকার নিয়েও ঝামেলা হয়। ২০০৮ সালে গুজরাটের আনন্দ শহরে সারেগেসি পদ্ধতিতে এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছিল। শিশুটি এক জাপানি দম্পতির ছিল। জন্মের আগেই জাপানি দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় শিশুটির কাস্টডির মামলা কোর্টে আটকে যায়। ফলে ওই সারোগেট মাদার মুশকিলে পড়ে যান। এসব চিন্তা করেই সারোগট মায়েদের সুরক্ষার জন্য এক নতুন আইন তৈরি করা হচ্ছে :

- কোনো ফার্টিলিটি ক্লিনিকে চাকুরি করতে পারবেন না।
- তাঁকে সারোগেসি এজেন্সির মাধ্যমে আসতে হবে।
- কোনো সারোগেট মা এক দম্পতির জন্য তিন বারের বেশি ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করাবেন না।
- শুধুমাত্র ভারতীয় দম্পতির জন্য গর্ভ ভাড়া দেওয়া যাবে।
- সন্তানের ওপর সারোগেট মায়ের কোনো অধিকার থাকবে না।
- সন্তান তার পিতা-মাতার পরিচয়ই পাবে।

গুজরাটের আনন্দ শহর সারোগেসির কেন্দ্ররূপে এখন সামনে এসে গেছে। এখানে কেবল হাসপাতাল ও ফার্টিলিটি সেন্টারে মাসে গড়ে ৩০টি শিশুর জন্ম হয়। ৫০০ সারোগেট মা নাম নথিভুক্ত করেছেন।

ভারতীয় সমাজে কোনো মায়ের গর্ভধারণ থেকে শিশুর জন্ম পর্যন্ত অনেকগুলি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সারোগেসি পদ্ধতি জন্ম হওয়া শিশু কি ওই সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আসে?

শাস্ত্রে বলে, প্রাকৃতিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ গর্ভধারণ, মায়ের স্নেহাঞ্চল, বাৎসল্যপূর্ণ দুধ এবং বাবার আদরই শিশুকে সাংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। ভাড়া করা গর্ভের সন্তান কি এসব পায়? পয়সার বিনিময়ে পাওয়া সন্তান মূল্যবোধ সম্পন্ন হয় কি? ■

নির্বাচনী যুদ্ধের পরাজয়ই শেষ নয়, কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করছে আরও বড় যুদ্ধ

অতিথি কলম

সুহাস পালশিকর

পরাজয় বরাবরই মানুষ বা দলকে নিস্তেজ করে দেয়। আর সেটা কংগ্রেস দল এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মহারাষ্ট্রের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী ক্ষেপে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লোকসভা পরাজয়ের জন্য সরাসরি দায়ী করে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন। অসমেও দলীয় সহকর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীকে হঠাতে বদ্ধ পরিকর। এগুলিকে কেবলমাত্র স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বলে ভাবলে ধোঁকায় পড়তে হবে। আদতে এসবই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ।

মনে রাখতে হবে, দল এই প্রথমবারই লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হলো এমনটা নয়। কিন্তু সকলেই জানেন ২০১৪-য় ভোট শতাংশই হোক আর আসন সংখ্যার বিলোপই হোক দু'দিক থেকেই কংগ্রেসে ধস নেমেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই দলের নেতা কর্মীরা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। এর কারণ খুঁজতে রানের পদত্যাগ আদৌ বড় কথা নয়। মূল রোগের শিকড় খুঁজলে দেখা যাবে— (১) সরকারে থাকা অবস্থায় কংগ্রেসের রেকর্ড কেমন? যে রাজ্যগুলিতে দল ক্ষমতাসীন ছিল বা রয়েছে সেখানে দলের কাজকর্ম ভয়ঙ্কর হতাশাব্যঞ্জক। কোনো নতুন নেতৃত্ব উঠে আসেনি। কোনো বৃহত্তর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। রাজ্যস্তরেও নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের দিশা নেই। আছে শুধু একই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বজনপোষণ, দুর্নীতি আর যথেচ্ছাচার যা দেখে সেখানকার রাজ্যবাসী শুধু নয় সাধারণ কর্মীরাও বীতশ্রদ্ধ।

> **যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলার মাধ্যমে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হবে না আবার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তা অনেকটাই যেমন নির্ভর করবে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের রাজনৈতিক মেধার ওপর, সঙ্গে মাঝারি স্তরের নেতাদের দলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর আন্তরিকতার ওপরও বটে।**

(২) কংগ্রেসের বর্তমানে কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচয়সূচক বা গোষ্ঠীভুক্ত ভোটব্যাঙ্ক নেই। দল যতই মুসলমান, দলিত বা বনবাসীরা তাদের গরিষ্ঠ সংখ্যায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি করুক না কেন। এই পরিতৃপ্তি বোধ আদতে ধোপে টেকেনি। কেননা বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান ভোটদাতার বাস সেখানে দল তাদের বলার মতো সমর্থন পায়নি। আবার উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব বা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে দলিতদের একটা বড় উপস্থিতি রয়েছে সেখানেও দল আশাব্যঞ্জক ফলাফল করতে পারেনি। অন্যদিকে ছত্তিশগড় বা ঝাড়খণ্ডের মতো বনবাসী প্রধান রাজ্যগুলিতে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট শতাংশ কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি। সম্পন্ন কৃষিজমি মালিক চাষিরা অনেক রাজ্যেই কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করেছে আর বনবাসীরা কখনোই কংগ্রেসের বাঁধা ভোটব্যাঙ্ক ছিল না। ঘটনা হলো গরিবরা নানান দলের মধ্যে তাদের সমর্থন বাঁটোয়ারা করে ফেলেছে, অন্যদিকে সামাজিক পরিচয়ে মধ্যবিত্তরা বরাবরই কংগ্রেসের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে দল দেশের প্রায় সমস্ত অংশেরই সমর্থন যোগাড়ে ব্যর্থ তার পক্ষে আর যাইহোক লোকসভা নির্বাচন জেতা তো সম্ভব নয়। কিন্তু এরই সংযোজিত মূল সমস্যা হলো অস্তিত্বও পরিচয় টিকিয়ে রাখার।

(৩) তৃতীয় কিন্তু অত্যন্ত গভীর সমস্যা হলো কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক অবক্ষয়। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে প্রায় ভগবানের পর্যায়ে অথচ রাজ্যের পর রাজ্যে দলের সংগঠন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্যের কথা, রাজ্যে নেতৃত্বের মধ্যে কোনো ক্ষোভ বা মতানৈক্য দেখা দিলে রাজ্যস্তরে তার মোকাবিলা করার মতো কোনো পন্থাই নির্ধারিত নেই। নেই কোনো অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রণালী। তাই তৈরি হয়নি কোনো স্থানীয় নেতৃত্ব বা একনিষ্ঠ কর্মী যাঁরা রয়েছেন তাঁরা শুধুই হাইকমান্ডের কৃপায় মধ্যসত্ত্বভোগী। কর্মীরা স্থানীয় কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও দলের আদর্শ বা রাজ্য সরকারগুলির কাজ কর্মের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্রে রানের বিদ্রোহ তাই সরাসরি হাইকমান্ডের বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ।

পরাজয়ের পরিণতি :

অবশ্যই বিপুল পরাজয় বা অগৌরবজনক হারের ক্ষেত্রেই এই ধরনের

খামতিগুলি ভেসে ওঠে। অথচ হারের পর দু'মাস কেটে গেলেও দলের মধ্যে সিরিয়াস কোনো চিন্তা ভাবনা বা সমস্যার স্থলে গিয়ে আত্মমন্থন তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না। নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার কোনো পথনির্দেশও নেই। অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমগুলিতে অনবরত দলের মাথায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনাগুলি যেন সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ওপর আলাদা বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মিডিয়ার চাপে নেতৃত্ব বদল করা হবে না মনস্থির করলেও পাশাপাশি অবমাননাকর পরাজয়ের মূলে নেতৃত্বের ভূমিকারও সামূহিক পর্যালোচনা করা হবে না এমনটা হতে পারে না। এর অর্থ বালিতে মুখ গুঁজে থাকা। এই পরিস্থিতিতে সব থেকে স্বাভাবিক ছিল সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তরফে একটি খোলামেলা অথচ পূর্বাপর দোষ ত্রুটির বিচার সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ দলিল তৈরি করা। এবং তা দলীয় স্তরে বিতরণ করা। কিন্তু কংগ্রেসের পালায়নপর কেন্দ্রীয় অধীশ্বরদের কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা বোধহয় কর্মীদের পক্ষে একান্তই বিলাসিতা। বাস্তবে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব যে ব্যর্থ হয়েছে সেকথা বুঝতে ভোট বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, কংগ্রেসের মধ্যে তাঁকে বাদ দিয়ে আর কেউ কি আছেন যিনি বিবদমান নানান গোষ্ঠী, উপদলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস দলের হাল ধরতে পারেন? যারা রাহুলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন তাঁরাও এ বিষয়ে আদৌ নিশ্চিত নন।

আসলে তারা চান রাহুল নৈবেদ্যর কাঁঠালিকলা হিসেবে থেকে যান আর তাঁরা কংগ্রেসে আদিকালের মত— অন্তর্দলীয় কোন্দল, স্বজনপোষণ আর পারস্পরিক চক্রান্ত চুটিয়ে চালিয়ে যান।

রোগের নির্ণয় :

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে বেশ কিছুদিন ধরেই কংগ্রেস দল তিন ধরনের মিশ্র দোলাচলের সঙ্কটে পড়েছে। এর মধ্যে প্রথম দলে আছেন সেই সমস্ত তরুণ তরুণী যারা ভোট বাজারে গায়ে গতরে খেটে জান লড়িয়ে দিয়েও সফল হতে পারেননি। এঁদের সমালোচনা করছেন সেই হিসেবে মাঠে না নামা বৌদ্ধিক প্যালেস- রাজনীতিওলারা। আর এক দলে আছেন সেই সমস্ত আদি মহীরুহের দল যারা হাইকমান্ডকে বুঝিয়ে এসেছেন আমরা দলকে জিতিয়ে আনব কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে আমরাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের লোক ঢোকানো, কাটমানির বন্দোবস্ত রাখব। চিরাচরিত ব্যবস্থা যেমন আছে তাতে যেন আঁচড় না পড়ে এই তাঁদের প্ল্যান। এঁরাই রাহুল গান্ধীর ওই প্রাইমারির মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত। এই দুই এপার ওপারের মাঝখানে রয়েছেন রাজীব-রাহুল সমর্থক বাহিনী। এঁরা চান দলে ব্যাপক সংস্কার তবে তা যেন বাস্তবানুগ হয়। তাঁরা চান দল যেন সর্বদাই প্রাপ্ত সুযোগগুলির ঠিকমতো সদ্ব্যবহারে সক্রিয় থাকে যাতে বোঝা যায় তারা ভবিষ্যৎ ক্ষমতার দাবিদার। তাঁরা আপোষ ও সংস্কারের সুষ্ঠু সমন্বয় চাইছেন। তাই মনে হয় কংগ্রেস নির্বাচনে পর্যদুস্ত হলেও তাদের আসল লড়াইটা ভেতরে। যা পুরোমাত্রায় এখনো শুরু হয়নি। সেই যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলার মাধ্যমে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হবে না আবার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তা অনেকটাই যেমন নির্ভর করবে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের রাজনৈতিক মেধার ওপর, সঙ্গে মাঝারি স্তরের নেতাদের দলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর আন্তরিকতার ওপরও বটে।

(লেখক পুনে ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

লালু নীতিশের যুগ্ম-সভা মাঠে মারা গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পূর্বতন জনতা দলের দুই বিহার অধিপতি লালু যাদব ও নীতিশ কুমারের বিজেপি ঝড় ঠেকাতে প্রথম যুগ্ম সভা নেহাতই মাঠে মারা গেল। গত ১১ আগস্ট হাজিপুরে দু' দলের জোট প্রার্থীর সমর্থনে সভা করতে একই হেলিকপ্টারে সফর করে হাজিপুরে নামেন বিজেপি আতঙ্কে ভোগা এই দুই নেতা। প্রসঙ্গত তিন মাস আগের লোকসভা নির্বাচনে ধুয়ে মুছে সাফ হওয়ার পর আগামী ২১ আগস্ট বিহারের ১০ আসনের উপনির্বাচন এঁদের কাছে মরণবাঁচন লড়াই।

প্রবল ঢক্কানিনাদ সহকারে জঙ্গলরাজ অধিপতি লালু (নীতিশের তকমা অনুযায়ী) ও দেশে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শাসন বলবৎ করে তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা নীতিশের এই স্বার্থান্বেষী মিলনকে রামবিলাস বন্যার সময় পরস্পরের শত্রু পশুপাখীদের একই জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, রাজধানী পাটনা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে শুভাই জামালপুরে একটি যাদব অধ্যুষিত অঞ্চলে এই সভার আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ ২৩ বছর পর এই দুই প্রবল জ্ঞাতিশত্রুর মিলন বিহারের জনমানসে যে প্রভাব ফেলতে পারেনি সভায় জনতার নগন্য উপস্থিতি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। আগামীদিনে এই সুযোগসন্ধানী মিলনের তাৎপর্য বিহারের মানুষকে বোঝাতে জোট কর্তাদের যে প্রবল কাঠখড় পোড়াতে হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে লালুর আর জে ডি পেয়েছিল ২০.৬ শতাংশ ভোট, জনতাদল (ইউ) এর ছিল ১৫.৮ ও বিরল প্রজাতির কংগ্রেসের ছিল শতকরা ৮.২ অঙ্কের ভোট। এঁরা সরল পাটীগণিতে পেয়েছেন এর যোগফল ৪৪ শতাংশ। এনডিএ-এর ভোট ছিল ৪০ শতাংশ। সুতরাং এই জোটের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই হিসেবকে মাথায় রেখেই বড় আশা করে সভার আয়োজন করেছিলেন লালু- নীতিশ বাহিনী। কিন্তু যে খেলার মাঠে তাঁদের বক্তব্য রাখার কথা তা খবর অনুযায়ী ছিল প্রায় ফাঁকা। নজরে পড়েছে দূরদর্শনের কিছু ও বি ভ্যান এবং ভিড়ের ছবি নিয়ে খবর

কুড়ি বছর বাদে একমঞ্চে লালু-নীতিশ।

প্রত্যাশী বেশ কিছু সাংবাদিক বাহিনী। সভায় আসা গ্রামবাসী রাম সুভগ জানালেন যে তাঁরা জানেনই না এখানে লালু-নীতিশের সভার আয়োজন করা হয়েছে। আর পাঁচটা সভার মতই তাঁরা এসেছেন।

ভোট অঙ্কের বাধ্য বাধকতা থেকে জুটি-বাঁধা লালু নীতিশের মঞ্চে আলিঙ্গনাবদ্ধ ছবি কাগজে বেরোলেও এই মহাজোটের সমর্থনে এদিন কোনো স্লোগান ওঠেনি। যদিও কার্যকর্তারা এটিকে সময়ের দাবি বলে ঢালাও প্রচারে নেমেছেন। সভায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তরে লালু হুঙ্কার দিয়ে বলেন নীতিশ তাঁর ছোট ভাই তাই তাঁর কোলে ফিরে আসবেন না তো বিজেপি-র কোলে বসবেন। হায়! গত বছর নীতিশ কার কোলে বসেছিলেন?

অন্যদিকে বিহারের পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ বিজেপি-কে তীব্র আক্রমণ করে বলেন বিজেপি-র সমাজকে বিভাজন করার নীতির বিরুদ্ধেই তিনি লড়াই শুরু করেছেন লালুকে নিয়ে।

প্রসঙ্গত গত ২০১৩ সালের জুন মাসে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদ প্রার্থী ঘোষণা করার পরই নীতিশ কুমার বিজেপি ছাড়েন। বিহারের নির্বাচনে ৪০টি লোকসভা আসনের মধ্যে মোদীর প্রতাপে তাঁর দল ২টি আসনে নেমে আসে। দলে বিদ্রোহ ঠেকাতে লজ্জায় তিনি পদত্যাগ করে নিজের তাঁবেদার জিতনরাম মাঝিকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সীতে বসান। নীতিশ আরও বলেন এখন তিনি ও পূর্বতন বিহার বন্ধু লালু এক হয়ে মহাশক্তিধর হয়ে উঠেছেন। এর ফলে বিজেপি-কে উড়িয়ে দিতে তাঁদের শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই সুবিধাবাদী জোটের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লালু বলেন এই জোট বিশেষ মজবুত সিমেন্ট-বালি দিয়ে তৈরি তাই বিজেপি হুঁশিয়ার। কিন্তু সংবাদ অনুযায়ী এই দৈববাণীগুলি শোনবার জন্য সেদিন মাঠে কয়েক শো দর্শকও মজুত ছিল না।

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME
LED
CFL
FAN
PIPES
The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

ভবানীপুর—কালীঘাটের দূরত্ব কতটা ?

শ্যামল কুমার হাতি

বাংলার রাজনীতিতে কলকাতার বাসিন্দারা অনেকেই সার্থক ভাবে নাম করেছেন। অনেকে আবার রাজ্য রাজনীতিতে অনেকটাই এগিয়েছেন। সফল রাজনেতার জন্য যে কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা চাণক্য বলেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো রাজধানীতে নিবাস। কথাটা সত্য। তাই কলকাতায় বসবাস করা লোকেরা চট করে যে সুযোগটা পান বা পেয়ে থাকেন, জেলার লোকেরা তা পায় না। তবে একথা ঠিক যে তাদের নিজস্ব গুণ থাকারও প্রয়োজন আছে। কলকাতার ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চন্দ্র বোস, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কালীঘাট নিবাসী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁদের মধ্যে পড়েন।

এই প্রসঙ্গে আগের কলকাতার নেতা ও বর্তমানের কলকাতার নেতাদের সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাই। এক্ষেত্রে কালীঘাট আর ভবানীপুরের নেতানেত্রীর কথা বলা যেতে পারে। আমি সোসিওলজিতে পড়েছি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পরিবেশের প্রভাব অনেক। ভবানীপুর আর কালীঘাটের পরিবেশের প্রভাব প্রায় এক হওয়ার কথা। ভবানীপুরে 'বাংলার বাঘের' ঘরে জন্মগ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ, পরে তিনি সত্যকারের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন। কালীঘাটের নেত্রীর মতো কয়েকবার ড. লিখে তা বন্ধ করে দিতে হয়নি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনক। তিনি কংগ্রেসের মতলব বুঝে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু সমাজের কাছে বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগের অধীনে বাংলার হিন্দুদের ভীষণ বিপদ। বাংলার মানুষ ড. মুখার্জির কথা শুনেছিলেন। তাই বাংলার আইন সভাতেও পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় অখণ্ড বাংলার ৩৩ শতাংশ জায়গা নিয়ে পশ্চিম বাংলা আজ ভারতের অঙ্গরাজ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বসেই দর্পের সঙ্গে বলছেন, ''বেশ করছি আমি মুসলমানদের বেশি সুবিধা দেব, এতে কারও কি বলার আছে?'' না, কারও কিছু বলার নেই। যাদের বলার তারা ২০১৬ সালে ভোটদান কেন্দ্রেই বলবে। তবে সেদিন যদি ড. শ্যামাপ্রসাদ না থাকতেন তবে কি ২০১৪ সালে মমতাদেবী আজ এই কথাগুলো বলার মতো জায়গায় থাকতেন? একবার ভাববেন। ভবানীপুরের অবদানে আজ কালীঘাটের দর্প। ড. শ্যামাপ্রসাদকে কংগ্রেস কমিউনিস্ট কম্বিনেশন মিলে সাম্প্রদায়িক প্রতিপন্ন করে গেছে। এখনও বেশ কয়েকজন শুভ্রকেশী

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে *বিরচিত*

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (১২ খণ্ডে)

তত্ত্বগত আলোচনা, স্বরলিপি, স্বরবিস্তার ও তালসহ বাংলায় অনূদিত। ২৪৩৫

ড. উৎপলা গোস্বামী

পূর্বতন অধ্যক্ষা বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্বতন ডিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ২৫০

বাংলা গানের বিবর্তন ৩০০

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস

ঠুমরী লহরী (তিনখণ্ডে) ৫৭৫

ঠুমরীর তত্ত্বগত আলোচনা, গায়ন পদ্ধতি, সমস্ত ঘরানার গায়কী ও গান। শতাধিক রাগে ৪৫০টি ঠুমরী গানের তালসহ স্বরলিপি।

গজল-এ-গুলিস্তাঁ ১৫০

তত্ত্বগত আলোচনা ও পঞ্চাশটি চিরায়ত গজল স্বরলিপি তাল সহ।

সপ্ততন্ত্রিকা তত্ত্ব (চারখণ্ডে) ২৭৫

সেতার, সরোদ, বেহালা ও অন্যান্য তারযন্ত্র বাদনের আকরগ্রন্থ। প্রতিটি রাগের উপর বিভিন্ন তালে প্রায় পঞ্চাশটি করে গৎ। তত্ত্বগত আলোচনা সহ।

তবলা বোধিকা (১ম) ১৫০

রাগতন্ত্রমালা (১ম) ২৫০

মহামতি অহোবল পণ্ডিত *বিরচিত*

সংগীত পারিজাত ১৫০

সংগীতশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মূল ও টীকা সহ সরল বঙ্গানুবাদ।

মণিকা সাহা *সম্পাদিত*

আগ্রা ঘরানা ১৩০

আগ্রা ঘরানার ইতিহাস। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সহ আগ্রা ঘরানার অন্যান্য নায়কদের জীবনী, গায়কী। ঘরানার প্রায় সমস্ত গান স্বরলিপি তাল ও স্বরবিস্তার সহ। বাংলায় অনূদিত।

গীতশ্রী গীতা সোম *সম্পাদিত*

ভজন ও ভক্তিগীতি মালিকা (মীরা বাঈ) (১মখণ্ড—৮৪টি রাগে) ১৬০

ভজন ও ভক্তিগীতি মালিকা (২য়খণ্ড) (ভক্তিগীতি তাল ও স্বরলিপি সহ। ৫৪টি রাগে) ১২০

জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর, সুরদাস, রুইদাস, রামদাস, ব্রহ্মানন্দ, হরিদাস, মলুকদাস, নরসী মেহতা ও সুখানন্দ।

ভজন ও ভক্তিগীতি মালিকা (৩য়খণ্ড) (ভক্তিগীতি তাল ও স্বরলিপি সহ। ৫৪টি রাগে) ১৩০

তুলসীদাস, নানক, দাদুদয়াল, আমীর খুসরো, তানসেন, বৈজুবাওরা, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, দরিয়া সাহেব, ইয়ারা সাহেব, সুন্দরদাস, রসখান, দুনীদাস।

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র নারায়ণ দত্ত

রাগসঙ্গীত ও প্রাচীন ভারত ১৭৫

প্রাচীন বৃহৎ ভারতবর্ষে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের উৎস সন্ধান।

তাপস আদিত্য, সংগীত কলানিধি

কণ্ঠসংগীত মধ্যমা ১৩০

মাধ্যমিক সংগীত পরীক্ষার শাস্ত্রীয় ও ক্রিয়াত্মক পাঠক্রম অনুসারে লিখিত একমাত্র পুস্তক। দশ বৎসরের প্রশ্নোত্তর সহ।

সুবোধচন্দ্র নন্দী, সংগীতশাস্ত্রী

উচ্চমাধ্যমিক সংগীতসুধা ১৫০

উচ্চমাধ্যমিক সংগীত পরীক্ষার শাস্ত্রীয় ও ক্রিয়াত্মক পাঠক্রম অনুসারে লিখিত একমাত্র পুস্তক।

সংগীতসুধা (১ম) ১০০ **সংগীতসুধা** (২য়) ১৩৫

প্রায় সমস্ত সঙ্গীত শিক্ষা সংস্থার পাঠক্রম অনুসারে লিখিত।

দীপায়ন

২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কল-৯

☎ ২২৪১-৪১৫০

E-mail : deepayan07@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোরস, দে'জপাবলিশিং, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মহেশ লাইব্রেরি

কমিউনিস্ট নেতা জীবিত আছেন। তাঁরা কি এর জবাব দেবেন? সোনিয়া কংগ্রেসের কাছে জবাব চাই না। ওরা কিছুই জানে না। কমিউনিস্ট বন্ধুদের বলতে চাই— মনে পড়ছে 'রশীদ আলী' দিবসের কথা? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রকে বৃটিশ পুলিশ নির্মম ভাবে হত্যা করার ফলে যে বিশাল ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল? মনে পড়ে সেদিন তারা নেতা খোঁজার জন্য শরৎ বোসের কাছে গিয়েছিলেন। শরৎ বোস পালিয়ে গিয়েছিলেন ভয়ে। ছাত্ররা বড়লাটের কাছে যাবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ ছিলেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিছু ছাত্রদরদি থাকতে না পেরে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মনে পড়ে কি শুভ্রকেশী কমিউনিস্ট বন্ধুদের? ড. শ্যামাপ্রসাদ বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, গুলি চালালে আগে তাকে গুলি করতে হবে। মনে পড়ছে? সাহস ছিল আপনাদের? কিসের লোভে ড. মুখোপাধ্যায় এই কাজ করেছিলেন? কিছুর জন্যই নয়। শুধু মানবিক কারণেই তিনি তাঁর বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তার জীবনের শেষ অধ্যায় তিনি নিজেই টেনেছিলেন। তিনি জানতেন কাশ্মীরে গেলে শেখ আবদুল্লার পুলিশ তাকে ছেড়ে দেবে না। তাই বহু রাষ্ট্রনেতার বারণ তিনি শোনেননি। তিনি কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বলে মানতেন। তার জন্য সেখানে যেতে কেন পারমিট নিতে হবে? এই ছিল তার প্রশ্ন। তাই তিনি একজন সাংসদ হিসাবে বিনা পারমিটে সেখানে গিয়েছিলেন, পরে বন্দি হন। সেখানেই তার মৃত্যু হয় মাত্র ৫২ বছরে। সেই মৃত্যুর রহস্য আজও আমরা জানতে পারিনি। তারই আত্মবলিদানে আজ কাশ্মীরে যেতে পারমিট লাগে না। বাংলার রাজনীতিতে ভবানীপুরের অবদান অনেক। তার কয়েকটি কথা সংক্ষেপেই জানালাম। আর কালীঘাট? সেখানকার নেত্রীর অবদান? তাও জানানো প্রয়োজন। তাঁর লক্ষ্য ছিল রাইটার্স বিল্ডিং দখল করা। অবশ্য বর্তমানে বাসা বদল করে তা নবান্ন হয়েছে। যাই হোক কালীঘাটের যত আন্দোলন ছিল তা শুধু লোক দেখানো, নিজের জন্য। যেখানেই কোনো অন্যায় হয়েছে মমতাময়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে গেছেন। তা মূক-বধির মেয়ে ধর্ষিতা হওয়াতে, রিজওয়ানুরের মৃত্যুতে, সিঙ্গুরে তাপসী মালিকের মৃত্যুতে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। আন্দোলন করেছেন। বাংলার মানুষ ধন্য ধন্য করেছেন। তাঁর পাশে আস্তে আস্তে বুদ্ধিজীবীরা ভিড় করেছেন। তাঁরা পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছেন। বাংলার মানুষও সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ তুলেছেন। সিপিএমের হাত আস্তে আস্তে আলগা হতে হতে ২০১১-য় তাদের সলিলসমাধি হয়েছে। আর দিনে দিনে জোড়া ফুল মোটা হয়েছে। যত গুণ্ডা মস্তান তোলাবাজ সিপিএমের সঙ্গে ছিল তারা জমি বদল করে জোড়াফুলের শিবিরে ভিড় করেছে। এখন তারা সিপিএমের মতো হাত দিয়ে মাথা কাটছে। যা খুশি তাই করছে। পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জবাব চাইছে গান্ধী হত্যার ফাইল ঠিক আছে তো? রাজনাথ বলেছেন যে তা সুরক্ষিত আছে। এটাই তো গণতন্ত্র। আমরা সবাই তো এরই পূজারি। ভাই জোড়াফুল, সারদার ফাইল, সুদীপ্ত সেনের ডায়েরি সব কোথায় গেল? ইডি কেন পেল না? সিবিআই কেন পেল না? একটু জবাব দেবেন? না, ওরা কেউ জবাব দিতে পারবে না। দিদির বারণ আছে। চাই না আমাদের জবাব। আমরা জানি, যে পুলিশ অফিসার এসব নষ্ট করেছেন তাকে দিদিভাই প্রমোশন দিয়েছেন। যে রিজওয়ানুর কাণ্ডে মমতা এত চোখের জল ফেলল। এত আন্দোলন করল আর এখন? অভিযুক্ত জ্ঞানবন্তের প্রমোশন হলো। জ্ঞানবন্ত ডি আই জি হলো। এক ঢিলে দুই পাখি। তার যা পাওয়ার ছিল তা তো পাওয়া হয়েই গেছে। তার চেয়ে এখন তার পুলিশের বেশি প্রয়োজন। তাই রিজকে ভুলে জ্ঞানবন্তের প্রমোশন। এতে আমাদের কিছু মনে করার নেই। এটা দিদির থুড়ি কালীঘাটের অধিকারের মধ্যে পড়ে। রিজওয়ানুর তাপসীরা এখন থাক ইতিহাস হয়ে। এখন আমার মনিরুল, অনুব্রত, তাপস পালেদের বাঁচাবার জন্য কালীঘাটের এখন অর্পণ ঘোষ, জ্ঞানবন্তরাই বেশি ভরসা। অর্পণ ঘোষ আই পি এস না হয়েও কালীঘাটের আশীর্বাদে কি সুন্দর ভাবে নদীয়ার পুলিশ সুপার হয়েছেন। এখন তো আর কোথাও অন্যায় হলে দৌড়াবার দরকার নেই। এখন তো বসে বসে কাজ। কী সুন্দর কলকাতার পরিবেশ। ভবানীপুরের ব্যক্তি জন্মেছিলেন ১৯০১ সালে, যতদূর মনে হয় তাঁর মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি সময়ে কালীঘাটের নেত্রীর জন্ম। তাঁদের জন্য একই শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু তাদের মধ্যে কত দূরত্ব। একজন শুধু দিয়ে গেল। বিচার পেল না। অন্যজন কায়দা করে সব পেল— কত কথা ভুলে গেল। রুকবানু ভাই দুঃখ করো না। কিছু তো পেয়েছে। এমএলএ হয়েছো। তোমার মাও তো কিছু পেয়েছিলেন। এটা তো দেওয়া নেওয়ার যুগ ভাই। এখন মা ভবানীর জয় না বলে বলো জয় মা কালী। এবার আপনারা বলুন ভবানীপুর আর কালীঘাটের দূরত্ব কতটা? ■

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER

OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.

** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.

** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.

** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016

98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com,

web : www.calcuttawaterproofing.com

পালোয়ান তৈরির গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারত। গত দুই দশকে ভারতে চলছে উন্নয়নের জোয়ার। এই উন্নয়নের জোয়ারে দেশটিতে নানামুখী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর একটি পেশা পরিবর্তন। যুগের চাহিদায় হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো পেশা, যুক্ত হচ্ছে অনেক নতুন পেশা। তেমনি একটা পেশা 'বাউন্সার।' সাধারণত বার, নাইটক্লাব, জুয়ার হাউসে উত্যক্তকারী ব্যক্তিকে শায়েস্তা করতে নিয়োগ দেওয়া পেশীবহুল মানুষকে বলা হয় বাউন্সার। তবে বাউন্সাররা যে শুধু নাইটক্লাব কিংবা বারে চাকরি করেন তা নয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বীমা, বিল্ডার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতেও

রয়েছে বাউন্সারদের চাহিদা। বর্তমানে অনেকেই যুক্ত হচ্ছেন ব্যতিক্রমী এ পেশায়। আর এর জন্য প্রয়োজন পেশীবহুল শরীর। ভারতের প্রত্যন্ত এক গ্রামে এই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যার জন্য অনেকেই এই গ্রামকে 'পালোয়ানদের গ্রাম' বলেন।

পালোয়ানদের গ্রাম দক্ষিণ দিল্লী থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরবর্তী আসোলা ফতেপুর বেরি। এ গ্রামের একটি ভিআইপি ফার্ম হাউসের নাইটক্লাবে বাউন্সার সাপ্লাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ফার্ম হাউসের প্রধান প্রশিক্ষক বিজয় তানোয়ার। তার তত্ত্বাবধানে গ্রামের প্রায় প্রতিটি ছেলেকে শারীরিক কসরতে পারদর্শী করা হয়। প্রধান প্রশিক্ষকের কাছ থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেট মিললেই তবে তারা শহরে গিয়ে চাকরির সন্ধান করতে পারেন। বিজয় তানোয়ারের বক্তব্য, ''একটু দূরেই দিল্লী শহর যখন ঘুমে মগ্ন থাকে, সেই ভোর ৪টে আমাদের গ্রামের সবাই আলস্য ঝেড়ে ফেলে জেগে ওঠে। শুরু হয় শরীর চর্চা। গ্রামের প্রতিটি ছেলেই আমার কাছে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এখানকার সব ছেলেই প্রতিদিন শারীরিক কসরত করে। শরীর সম্পর্কে তারা বেশ সচেতন। তাদের মধ্যে কেউই মদ খায় না, এমনকী সিগারেটও সেবন করে না।'' স্থানীয় অনেকের ধারণা, শারীরিক কসরতের কারণে তারা একদিন অলিম্পিকে যেতে পারবে। কিন্তু বেশিরভাগ চাষি পরিবার থেকে আসা এই যুবকরা কেউই অলিম্পিক বা অন্যান্য খেলায় যায় না। কারণ অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের বাধ্য করে নাইটক্লাবের বাউন্সার হতে। গুরগাঁওয়ের প্রায় ২০০ জন তরুণ বিভিন্ন নাইটক্লাব ও পাবে চাকরি করেন। এছাড়া স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তির দেহরক্ষী হিসেবেও তাঁরা কাজ করেন। তবে এই বাউন্সারদের নির্দিষ্ট কোনো পারিশ্রমিক নেই। বড় বড় নাইটক্লাবগুলোতে অনেক সময় একেক জন বাউন্সারকে মাসিক ৫০ হাজার টাকা চুক্তিতেও নেওয়া হয়। আবার কখনও মাত্র ১০০০ টাকার বিনিময়েও অনেক বাউন্সারকে কাজ করতে হয়।

পারিশ্রমিকের বিষয়টি মূলত নির্ভর করে কাকে কতটা বীভৎস দেখতে তার উপর। এক সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুসতাক খান নামের একজন বাউন্সার বলেন, ''আমাদের পেশী এবং চাহনিই অনেক সমস্যা সমাধান করার জন্য যথেষ্ট। আপনার চেয়ে দ্বিগুণ সাইজের কেউ যখন আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি ভড়কে যাবেন।'' কেন বাড়ছে তাদের চাহিদা? —এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কয়েক বছর ধরেই নাইটক্লাব সংস্কৃতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবি পপ গান আর ভিনদেশী হেভি মেটাল গানের কল্যাণে দিল্লীর আনাচে কানাচে অনেক ক্লাব গজিয়ে উঠছে। যেখানে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের সন্তানরা অবসর বিনোদন করে। ভিনদেশী সংস্কৃতি গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাড়ছে নাইটক্লাবের সংখ্যা তেমনি এই ক্লাবগুলোতে মারামারির পরিমাণও বাড়ছে। আর এই মারামারি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সমাধানে নাইটক্লাবগুলো ব্যবহার করছে বাউন্সারদের। দিল্লীর বেশিরভাগ নাইটক্লাবেই এ ধরনের মারকুটে চেহারার অনেককে দেখতে পাওয়া যায়। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

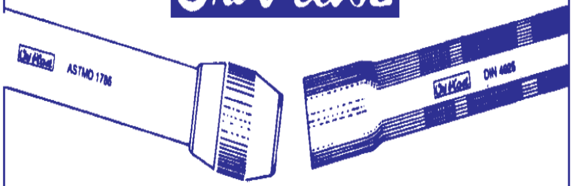

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"সমগ্র হিন্দুজাতি এই ধর্মের উচ্চতম দর্শনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। বহুবিদিত বেদান্ত ধর্ম সেই সমন্বয়ের আদর্শ, তারই উপাদানে সাধারণের জীবন গঠিত।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের মধ্যে কেবল এই ধর্মেরই একাংশে সর্বজনীন সত্য ও অব্যক্ত ব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা এবং তথাকথিত সহজতম বিশ্বাসযোগ্য মতবাদসমূহের সঙ্গে বেদান্তোক্ত সত্যের নির্ভীক তুলনামূলক বিচার দেখা যায়— হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

টাকা নয়, রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই উত্তরবঙ্গে ব্যাপক এনকেফেলাইটিস

ডাঃ মলয় সাহা

বর্তমানে উত্তরবঙ্গে এনকেফেলাইটিস নামক ভাইরাস ঘটিত রোগটি মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। সরকারি হিসাবে এই রোগের আক্রমণে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১৭০ জন, যদিও বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যাটি প্রায় ৩১৫ জন। বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গেও ২ জন এই রোগে মৃত্যুর শিকার। এখন কোটি টাকার প্রশ্ন হলো, কেন প্রতিবছর উত্তরবঙ্গে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা বা এনকেফেলাইটিস- এর আক্রমণে বহু লোকের মৃত্যু ঘটছে। আর এই মৃত্যু মিছিলের বেশির ভাগ বাসিন্দাই হলো চা বাগানের শ্রমিক বস্তি এলাকার বা তার নিকটস্থ অঞ্চলের। প্রতি বছর এই মহামারী রোগের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, সংক্রমণ এবং রোগীর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চা-বাগানের অর্থনীতি।

উত্তরবঙ্গে বড় ২২টি চা-বাগানের মধ্যে ১৭টি চা-বাগান আজ বন্ধ। ছোট বাগানগুলি অধিকাংশই বন্ধ অথবা বন্ধের মুখে। বিগত ৩০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক সংগঠনের নামে শ্রমিকদের শোষণ করেছে। আর শ্রমিক নেতা তথা শ্রমিক ঠিকাদারেরা বা আঞ্চলিক নেতারা শ্রমিকদের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠেছে। যেখানে চা-বাগানের সরকারি ন্যূনতম মজুরি ২১০ টাকা সেখানে শ্রমিক নেতারা রাতের অন্ধকারে মালিক পক্ষের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি করে এবং কোটি কোটি টাকা ঘুষ খেয়ে শ্রমিকদের ৮৫ টাকা মজুরি নিতে বাধ্য করছে। শুধু তাই নয়, এই ৮৫ টাকার মধ্যেও ১০ টাকা প্রতিদিন পার্টি অফিসে জমা হয়। যার ফলে শ্রমিকের সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর হাতে পায় মাত্র ৭৫ টাকা।

পাঠকদের মধ্যে যদি কারো চা-বাগানের বস্তিতে যাওয়ার সুযোগ হয় (বাস্তবে দুর্ভাগ্য) তবে দেখতে পাবেন যে চা-শ্রমিকরা মানুষ হয়েও কীটপতঙ্গ থেকেও নিম্নমানের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা ৬ ফুট বাই ১০ ফুট মাটির ঘরে, যার ছাদ হোগলাপাতা বা ভাঙা টিনের হয়, ঘরগুলি মুখোমুখি সারিবদ্ধ ভাবে হয়। আলো হাওয়া প্রায় প্রবেশ করে না বললেই চলে। মোটামুটি ১৫ থেকে ২০টি ঘর প্রতি একটি কাঁচা পায়খানা থাকে। এই বস্তিগুলিতে কোনো পরিকল্পনামাফিক নর্দমা হয় না। যার ফলে বস্তির মাঝখান দিয়ে বা রাস্তার গা ঘেষে কাঁচা নর্দমা থাকে। সব মিলিয়ে এক নারকীয় পরিবেশ।

এই চা-শ্রমিকদের অধিকাংশই অর্থকরী পশুপালন করে। যার মধ্যে মূলত শুয়োর, মুরগি এবং হাঁস থাকে। এই গৃহপালিত পশুপাখিরা একই ঘরে মানুষের সঙ্গেই রাত্রি যাপন করে। ঘর প্রতি জনসংখ্যা ৫ থেকে ৮ জন হয়। চা-বাগানের মালিকপক্ষ বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতারা এদের জীবনযাত্রা বা বস্তি উন্নয়নের ব্যাপারে কোনোদিন দৃষ্টিপাত করেননি। এই চূড়ান্ত নারকীয় অমানবিক পরিবেশের মধ্যে মশার বংশবৃদ্ধি ঘটে তথা বিভিন্ন রোগ বা জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। এমনিতেই সুষম খাবারের অভাবে এরা প্রায় সকলেই রক্তাল্পতার শিকার এবং রুগ্ন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক কমে যায়। তাই প্রতি বছর বিভিন্ন রোগের সংক্রমণে ও অপুষ্টিজনিত কারণে কয়েক শত লোকের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুমিছিলের মৃতদেহ তথা সংখ্যা নিয়ে চলে এক নোংরা রাজনৈতিক খেলা।

যাই হোক, গত বছর এই মৃত্যুমিছিলের কারণ ছিল ডেঙ্গু। এই বছর কারণ হলো এনকেফেলাইটিস। বর্তমানে এই এনকেফেলাইটিস রোগ মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাতটি ফিভার ক্লিনিক খুলেছে। যেগুলির অবস্থান হলো দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এই কেন্দ্রগুলির অবস্থান হয় জেলা হাসপাতালে অথবা জেলার মুখ্য আধিকারিকের অফিসের পাশে। অথচ যেখান থেকে এই রোগের সৃষ্টি সেই চা-বাগানগুলো অবহেলিত হচ্ছে। হতদরিদ্র

মানুষগুলো যখন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে প্রায় ৫০-৮০ কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি ভাড়া করে অসুস্থ রুগিকে ফিভার ক্লিনিক-এ নিয়ে আসা। স্বভাবতই তারা আঞ্চলিক হাতুড়ে ডাক্তার বা গুনিন বা ওঝার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়--- যার ফল এনকেফেলাইটিস-এ নিশ্চিত মৃত্যু।

সরকারের উচিত প্রতিটি চা-বাগানের বস্তিতে প্রশিক্ষিত ডাক্তার পাঠানো এবং বস্তির পরিবেশ উন্নয়ন করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো। বাস্তবে সরকার গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছে। সরকার যে সমস্ত ফিভার ক্লিনিক খুলেছে, সেখানে ডাক্তার আছে মাত্র ক্লিনিক প্রতি ২ জন। আর রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন ৫০০ থেকে ১২০০।

যে কোনো সুস্থ মনের মানুষ বুঝতে পারবেন যে দুইজন ডাক্তারের পক্ষে এই বিপুল সংখ্যক রুগি দেখা সম্ভব নয়। এর ফলে ডাক্তারের ওপর এক ভয়াবহ মানসিক চাপ তৈরি হয়— যার ফলশ্রুতি চিকিৎসায় ভুলভ্রান্তি।

দ্বিতীয় অবশ্যই করতে হবে। যথা—

(১) শিড়দাঁড়ায় লাম্বার স্পাইন (Lumber Spine) ছিদ্র করে সি এস এফ (Cerebro-Spinal Fluid) নিতে হবে এবং এই রসের প্রোটিন ও কালচার পরীক্ষা করতে হবে।

(২) মাথার সিটি স্ক্যান বা এম আর আই (CT Scan / MRI) করে দেখতে হবে, মস্তিষ্কের টেমপোরাল লোব স্ফীত হয়েছে কিনা। প্রয়োজনে MYELOGRAM করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের কথা, সরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় এই গুলির কোনো ব্যবস্থাই নাই। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ১টি সিটি স্ক্যান মেশিন আছে। মাত্র একটি মেশিনের পক্ষে রোগীর এই মারাত্মক চাপ নেওয়া সম্ভব নয়, (এক একটি সিটি স্ক্যান করতে ৩০ মিনিট সময় লাগে— কয়েকটি করার পরে মেশিন গরম হয়ে যায়) যার ফলে অসুস্থ রুগিদের প্রাইভেট ক্লিনিকে ৫০০০-৮০০০ টাকা খরচ করে সিটি স্ক্যান বা এম আর আই করতে হয়। আর যারা হতদরিদ্র তারা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। এছাড়া এনকেফেলাইটিস-এর ঔষধ ACYCLOVIR সরকারি হসপিটালে যথেষ্ট সাপ্লাই নেই। এটি খুব দামি ঔষধ। যাদেব বাইরের ঔষধের দোকান থেকে কিনে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। তারাও নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। (গড়ে ৩০০ টাকা করে ন্যূনতম ১০ দিন)।

প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের এই মৃত্যুমিছিল বন্ধ করার জন্য দরকার রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সরকারি স্তরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

(১) দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক আলাপচারিতার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলি খুলতে হবে এবং চা-শিল্পকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(২) চা-বাগানের শ্রমিকরা যাতে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি পায় তার ব্যবস্থা করা।

(৩) চা-শিল্পকে বাঁচানো, ব্যবসা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য সরকারের আলাদা একটি ডাইরেটরেট করতে হবে। (প্রয়োজনে দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী)

(৪) চা-বাগানের শ্রমিক বস্তির উন্নয়ন।

(৫) চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনশৈলী ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি।

(৬) গৃহপালিত পশুদের জন্য লোকালয় থেকে দূরে আলাদা Cattle HVB-এর ব্যবস্থা করা।

(৭) বস্তি এলাকার লোকেদের জন্য ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) সরকারি উদ্যোগে প্রতিটি জলাশয়ে গাপ্পি মাছ ছাড়তে হবে।

(৯) সমগ্র উত্তরবঙ্গের জন্য মহামারী বিশেষজ্ঞ দল গঠন ও তাদের সুপারিশ কার্যকর করা।

(১০) সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মহামারী রোগের প্রতিষেধক প্রদান বা টিকাকরণ (টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি)।

(১১) প্রতিটি জেলা হাসপাতালে অন্তত একজন মহামারী বিশেষজ্ঞর পদ সৃষ্টি করা।

(১২) উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলির আধুনিককরণ।

(১৩) সমস্ত বস্তি এলাকাগুলিতে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী/ডাক্তার দ্বারা পর্যবেক্ষণ।

(১৪) খোলা কাঁচা নর্দমা ও কাঁচা পায়খানাগুলিকে পাকা করা।

(১৫) মাসে অন্তত দু'বার খোলা নর্দমাগুলিতে মশা মারার তেল দিতে হবে। কারণ মশার লাভার উপর ব্লিচিং পাউডার বা ফিনাইল কাজ করে না।

যাইহোক, গত বছর (২০১৩-২০১৪) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে মহামারী রোগ প্রতিরোধ করার জন্য দু'বার মোট ৩৬.৩৭ কোটি টাকা (৮.০৮ কোটি + ২৪.২৭ কোটি) অনুদান হিসাবে দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে রাজ্য সরকার মাত্র ১২.২১ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে। বাকি ২৪.১৬ কোটি টাকা রাজ্য সরকার খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২০১৪-'১৫ সালে কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারের হাতে এসে পৌঁছেছে ১৬.৪ কোটি টাকা। রাজ্যের হাতে মোট টাকার পরিমাণ ৪০.৫৬ কোটি টাকা। (১৬.৪ কোটি + ২৪.১৬ কোটি)। অথচ উত্তরবঙ্গে এই মহামারীর মধ্যেও রাজ্য সরকার এখন অব্দি খরচ করতে পেরেছে মাত্র ১৮.০৪ কোটি টাকা। বাকি টাকা খরচ না হয়ে পড়ে আছে (২২.৬২ কোটি) (৫ আগস্ট, টেলিগ্রাফ) ২০০৯-২০১৩, এছাড়া এই পাঁচ বছরের জন্য WHO বিশ্বব্যাঙ্ক VECTOR বা মহামারী রোগ প্রতিরোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মোট ১২৮টি ব্লকে মোট $ 250 million U. S. Doller অনুদান দিয়েছে। যার মধ্যে ৩৭টি ব্লক পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার প্রাপ্য টাকার মাত্র ৪০ শতাংশ টাকা খরচ করতে পেরেছে।

গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের 'এক ঘর, এক শৌচালয়' প্রকল্পে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের থেকে মোট ৮০ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। অথচ বাংলার দুর্ভাগ্য, রাজ্য সরকার মাত্র ৫২.৪ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে। ■

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান

‘‘ডাক্তার হেডগেওয়ার দেশবাসীকে স্মরণ করে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষ হিন্দুরাষ্ট্র। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো রাজার সিংহাসনের তলায় এই রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়নি। এদেশের অগণিত ঋষি, মহাপুরুষ এই রাষ্ট্র ভাবনার ধারক ও বাহক।’’ ---গত ১৫ আগস্ট কলকাতার বড়বাজারের ওসোয়াল ভবনে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত ‘ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞাসম্মান’ অনুষ্ঠানে এ কথাগুলি বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল।

সভাগৃহ ভর্তি কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সামনে তিনি যখন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলি বলছিলেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলী ঘনঘন করতালিতে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। তিনি বলেন— ‘‘গত ১৮ মে ইংল্যান্ডের ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লেখে — ‘১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু ১৬ মে সেই স্বাধীনতার পূর্ণরূপ পাওয়ার আর এক পদক্ষেপ শুরু হলো’। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সূর্য ১৯২৫ সালেই উদয় হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই। ডাঃ হেডগেওয়ার সমস্যার মূল সন্ধান করে তার সমাধানের পথ বের করেন।’’ উল্লেখ্য, বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে এবার ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান দেওয়া হয় যশস্বী ইতিহাসবিদ কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্তলকে। ড. কৃষ্ণগোপাল বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে অধ্যাপক মিত্তলকে মানপত্র হাতে তুলে দিয়ে ও সম্মান জানিয়ে বলেন--- ‘‘ডাঃ হেডগেওয়ার লোকনির্মাণের দ্বারা রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণের যে কাজ শুরু করেছিলেন শ্রীমিত্তল সেই পরম্পরাই একজন। তিনি দেশবাসীর সমানে দেশের ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি শুধরে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন।’’ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি সজ্জন ভজনকা এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর।

স্বস্তিকা

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
সংখ্যার আকর্ষণ

সঙ্কটে উত্তরবঙ্গের

চা-শিল্প

লিখেছেন সৌমেন নাগ, রামবতার শর্মা ও ভীষ্মদেব মেধি প্রমুখ

কাঁথি মাতঙ্গিনী সেবা ভারতীর রক্ত শিবির

গত ১৬ আগস্ট ৬৮তম স্বাধীনতা দিবস ও জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে কাঁথি মাতঙ্গিনী সেবা ভারতীর উদ্যোগে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির কার্যালয় মাধবতীর্থে ‘রক্ত নিবেদন’ শিবিরের আয়োজন করা হয়। কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ানদের একটি দল রক্ত সংগ্রহ করেন। ৪৩ জন এই শিবিরে রক্ত নিবেদন করেন। শিবির পরিচালনা করেন মাতঙ্গিনী সেবা ভারতীর সম্পাদক সঞ্জীব জানা। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ প্রকাশ মণ্ডল, তমাল পল্লব বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ মাল, কনিষ্ক পণ্ডা, যাত্রাশিল্পী অমিত কুমার প্রমুখ।

পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের সাধারণ সভা

গত ২৭ জুলাই কলকাতার মানিকতলায় ‘নরেশ ভবনে’ অনুষ্ঠিত হয় ‘পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ)’-এর বার্ষিক সাধারণ সভা। সভাপতিত্ব করেন মেজর জেনারেল (অঃ প্রা) কে কে গঙ্গোপাধ্যায়।

সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক কর্নেল (অঃ প্রা) মহেশ গান্ধী পর্যবেক্ষক রূপে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার (অঃ প্রা) এ কে দত্ত (ভি এস এম) ও সুবেদার (অঃ প্রা) অসীম দে যথাক্রমে রাজ্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হয়ে নতুন সমিতি গঠিত হয়।

গো-রক্ষায় অভ্যাস বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষে অখিল ভারতীয় 'গো-বংশ রক্ষণ-সংবর্ধন' পরিষদ আয়োজিত ভারতীয় গো-বংশের উপযোগিতা বিষয়ে রাজস্থানের আজমীরের পুষ্করে গত ১ থেকে ৩ আগস্ট ৩ দিনের একটি অভ্যাস বর্গ সুচারুরূপে সম্পন্ন হলো।

উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অর্ন্তরাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায়জী বলেন, ১৯৬৪ সালে কেবলমাত্র গো-রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর পৌরোহিত্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এর আগে ১৯৫২ সালে ৭ ডিসেম্বর গো-হত্যা বন্ধের জন্য এক কোটি সত্তর লক্ষের বেশি লোকের স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদনপত্র শ্রীগুরুজী, সৎগুরু প্রতাপ সিংজী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী হংসরাজ গুপ্তাজী রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে অর্পণ করেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গো-হত্যা বন্ধের জন্য কোনো কার্যকরি আইন প্রণয়ন করেনি। যদিও দেশ রক্ষার জন্য গো-হত্যা নিবারণ আইন অত্যন্ত জরুরি।

এই অভ্যাস বর্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় সহস্রাধিক গো-সেবক উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের গো-রক্ষা প্রমুখ অঞ্জন বিশ্বাস ও সম্পাদক ডাঃ অরুণ কুমার গিরির নেতৃত্বে ৩ জন সন্ত ও ৪ জন মাতৃমণ্ডলীসহ ২৫ জন কার্যকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালার বক্তব্য— ভারতের আর্থিক মেরুদণ্ড হলো ভারতীয় গো-বংশ। পঞ্চগব্য ঔষধি, জৈবিক কৃষি, গো-উৎপাদন সামগ্রীর বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করাতে হবে। গো-পালনের জন্য, গো-চারণভূমি উদ্ধারের কাজে লাগতে হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্তরাষ্ট্রীয় কার্যকরী অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীণভাই তোগড়িয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে গো-হত্যা বন্ধের জন্য কঠোর আইন সত্বর কার্যকরি করার আবেদন জানান।

রাজস্থানের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী প্রভুলাল সোনী বলেছেন— রাজস্থান সরকার গো-রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর জন্য যথাসম্ভব সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তার রাজ্যে ১৪০৭টি গো-শালা দেশের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। রাজস্থানে ১৯৯৯ সাল থেকে কোনো গো-বংশ রাজ্যের বাহিরে যায় না। এর অন্যথা হলে ৭-১৫ বছর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এখন গো-চারণভূমি উদ্ধারের কাজ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে।

মঙ্গলনিধি

গত ৩১ জুলাই দুর্গাপুর নগরের সহ-নগর সেবা প্রমুখ এবং বিশিষ্ট নিউরোথেরাপিস্ট দেবনারায়ণ মাহাতো তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জন্মের ৬ দিনের দিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদানের কার্যক্রম করেন। উক্ত আনন্দ অনুষ্ঠানে সমাজের উপেক্ষিত শিশুদের বিকাশের জন্য পাঁচ হাজার টাকা প্রান্ত সেবা প্রমুখের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে নগর কার্যবাহ যোগীন্দর রাম উপস্থিত সকলের সামনে মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। উল্লেখ্য, দেবনারায়ণ মাহাতোর প্রচেষ্টায় গত চার বছর ধরে দুর্গাপুরের বিখ্যাত ভিড়িঙ্গী কালীবাড়িতে একটি নিউরোথেরাপির সেবা কেন্দ্র চলছে।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার গাজোল খণ্ডের আটিলা শাখার স্বয়ংসেবক এবং বিজেপির গাজোল মণ্ডল কমিটির সম্পাদক মুরলীধর সরকারের মাতৃদেবী পদ্মমণি সরকার (৯০) গত ৩১ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের বিহারীটোলা গ্রামের স্বয়ংসেবক সুরেন মণ্ডল (৬৮) গত ৩১ জুলাই সকালে পরলোকগমন করেন। তিনি চার পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ্য পুত্র তপন মণ্ডল সঙ্ঘের দায়িত্বে রয়েছেন।

***

গত ২৯ জুলাই সকালে কলকাতা বিজেপির ১১৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি দীপঙ্কর ঘোষের মাতৃদেবী রেবা ঘোষ ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। গত ৮ আগস্ট দীপঙ্কর ঘোষের স্ত্রী হাইকোর্টের আইনজীবী সর্বাণী ঘোষ ৫২ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

বাংলার কুস্তির হাল ফিরবে কবে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সময়ে উত্তর কলকাতার যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবরবাবু)-র আখড়া ছিল বাংলা তথা সারা ভারতের কুস্তির প্রাণকেন্দ্র। সারা দেশের বড় বড় পালোয়ানরা গোবরবাবুর আখড়ায় আসতেন কুস্তির প্যাঁচ পয়জার ঝালিয়ে নিতে। শরীরকে সুঠাম করে গড়ে তুলতে এই আখড়ায় এক সময় আসতেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও। পাশের অঞ্চলে ছিল পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতি। এই ব্যায়াম সমিতি থেকে উঠে এসেছিলেন কিংবদন্তী কুস্তিগীর দেওয়া খাসাবা দাদাসাহেব যাদব (কেডি যাদব)। যিনি ১৯৫২ সালে জেলাসিংকী অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। সে সময় হকির পর কুস্তিই অলিম্পিকে ভারতকে সবেধন নীলমণি মহার্ঘ পদকটি দিতে পেরেছিল। এই কৃতিত্ব ১৯৯৬ পর্যন্ত অটুট ছিল। ৯৬-এ আটলান্টা অলিম্পিয়াডে টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ ব্রোঞ্জ জিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিগত বিভাগে পদকজয়ীর তালিকায় উঠে আসেন।

এই ব্যায়াম সমিতিতে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে ৪৮-এ লন্ডন অলিম্পিয়াডে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যান নির্মল বসু। তিনি পরের বার জেলাসিংকীতেও গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আর এক বাঙালি কুস্তিগীর নিরঞ্জন দাস, যার কুস্তি শিক্ষার আতুড়ঘর গোবর গুহর আখড়া। ৫৬-তে মেলবোর্ন গেমসে অংশ নিয়েছিলেন এই আখড়ারই তারকেশ্বর পাণ্ডে। এশিয়ান গেমস, অলিম্পিকে ভারতীয় দলে সে সময়ে বাঙালি কুস্তিগীর থাকাটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর আজ, এরকম অন্ধকারের মধ্যে শুধুই স্মৃতিরোমন্থন করা। গত ৫০ বছরে ভারতীয় দলে বাংলার কোনো প্রতিনিধি আর সুযোগ পাননি। বাংলার পালোয়ানরা সব গেলেন কোথায়? আখড়াগুলিরই বা কি দশা?

বাংলা থেকে সুশীল কুমার, যোগেশ্বর দত্তের মতো আন্তর্জাতিক মানের কুস্তিগীর উঠে না আসার কারণটা কি? সরকারের উদাসীনতা না আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব? রাজ্য কুস্তি সংস্থার কর্তাদের অভিমত হরিয়ানা, দিল্লী, পাঞ্জাবে সরকার প্রচুর আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে প্রদান করছে বলেই ওইসব জায়গা থেকে ভালমানের কুস্তিগীর উঠে আসছে। ওই তিন রাজ্য ছাড়া মহারাষ্ট্র, রাজস্থানেও বেশ উন্নত পরিকাঠামো রয়েছে। ফলে কুস্তির জনপ্রিয়তা ও ইতিবাচক পরিণতি দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যগুলিতে। আধুনিক ম্যাটে, উন্নত পরিবেশে বছরের পর বছর অনুশীলন করে বিদেশী শক্তিশালী পালোয়ানদের মহড়া নেওয়ার জন্য সবদিক থেকে তৈরি হয়ে উঠছে। যার ফল এশিয়ার্ড, কমনওয়েলথে এই বিভাগ থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি পদক বেরিয়ে আসা। এমনকী গত লন্ডন অলিম্পিয়াড কুস্তি থেকে একটি করে রূপো ও ব্রোঞ্জ এসেছে। অথচ বাংলায় যে কটা আখড়া চলছে তার কোথাও আধুনিক ম্যাট্রেস নেই। আন্তর্জাতিক স্তরে লড়াই করতে হয় ম্যাট্রেসের ওপর। যার দাম প্রায় দশ লক্ষ টাকা। আখড়াগুলির সেই সামর্থ্য নেই যে নিজেরাই ম্যাট্রেস কিনবে। রাজ্য সংস্থার জনৈক কর্তা বলেছেন জঙ্গলমহলে ছেলেদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে। ওখানে যদি ম্যাট্রেস পাঠিয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তবে অচিরেই বাংলার কুস্তির দৈন্যদশা কেটে যাবে। এখানেই এসে পড়ে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (সাই) ভূমিকার কথাও উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে কুস্তির উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে সাইড। প্রচুর স্কুল অধিগ্রহণ করেছে সাই। কিন্তু এখানে সাইকর্তারা রাজ্য সংস্থার অনুরোধে কর্ণপাত করছে না। কলকাতা, বর্ধমান, শিলিগুড়ি সাই সেন্টারে কুস্তি একপ্রকার উপেক্ষিতই বলা চলে। রাজ্যসংস্থার সচিবের ক্লাবে অবশ্য আন্তর্জাতিক মানের ম্যাট্রেস আছে। সেখানে যেটুকু আধুনিক অনুশীলনের সুযোগ পান শিক্ষার্থী কুস্তিগীররা। বাংলার কোচেদের অভিমত, সরকার ও বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলি যদি কুস্তি সঠিক ভাবে 'প্রমোট' করতে পারে, আধুনিক ব্যবস্থাপনা সহযোগে, তবে এই বাংলা থেকেও আন্তর্জাতিক স্তরের সব বড় বড় ইভেন্টে পদকজয়ীরা বেরিয়ে আসবে।

তবে আশার আলো একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় কুস্তিগীরদের গৌরব গরিমা দেখার পর সারা দেশে কুস্তির ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তা পরিব্যাপ্ত করতে বিশেষ কিছু পরিকল্পনা নিতে পারে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ও লক্ষ্মী মিত্তল ফাউন্ডেশন। দেশের নিজস্ব ক্রীড়া-শরীরচর্চার ওপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করতে চান ক্রীড়ামন্ত্রী সোনওয়াল। তাই কুস্তি, তিরন্দাজি, কবাডি, দাবা এই খেলাগুলির ব্যাপারে 'ফোকাস' ঠিক রেখে বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে ক্রীড়ামন্ত্রক। আর সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে লক্ষ্মী মিত্তল ফাউন্ডেশনও ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। কুস্তি থেকে আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে এত পদক আসছে, তাই আরো বেশি আধুনিক সুযোগ-সুবিধে সমন্বিত আখড়া গড়ে তুলতে পারলে অনেক বেশি সংখ্যায় পুরুষ ও মহিলা কুস্তি প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। আর প্রাথমিক স্তরে ভারতীয় কোচেদের কাছে অনুশীলন করে একটু বড় হবার পর ইউরোপীয় কোচেদের কাছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে দেশজ সনাতন পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় কোচিং সিস্টেমের মেলবন্ধনে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আঙ্গিকের কুস্তিগীর হয়ে উঠবে। আরো বেশি আন্তর্জাতিক পদক তখন সহজলভ্য হবে।

শব্দরূপ-৭২০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ''অবস্থা বুঝে—'' (জনবুলি); বন্দোবস্ত, আয়োজন, **৩.** ভারতবর্ষের অন্য নাম, শেষ দুয়ে জায়গা, **৪.** তুলনায় অপেক্ষাকৃত যথার্থ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত অব্যয়পদ, **৫.** চাকার পাখি, **৬.** সন্দীপন মুনির পুত্র; শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু, **৮.** কণ্ঠশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ ('বেশি খেয়ে—করা'), **১০.** পিঠা বিশেষ, **১১.** মালদহ অঞ্চলের বৃহদাকার আম, **১৩.** শাস্ত্রীয় সংগীতের সকালবেলার এক রাগ, **১৪.** নেউল, বেজি; চতুর্থ পাণ্ডব।

উপর-নীচ : ১. প্রকাশিত, প্রকট, **২.** এমন আন্দোলন ছিল জাতির জনক গান্ধীজীর অস্ত্র, **৩.** ঈর্ষা, অসূয়া, **৫.** এমন আন্দোলন ছিল জাতির জনক গান্ধীজীর অস্ত্র, **৭.** যোগসূত্র ও পাণিনিভাষ্যে রচয়িতা ঋষি, **৯.** পুঁটিমাছ, **১০.** তট ('যমুনা—'), **১২.** '—পাকলে কাকের কি?' (প্রবচন)

সমাধান
শব্দরূপ-৭১৭

অ	■	■	স	ত্য	ভা	মা	■
ন্ন	■	■	ঙ্গ	■	র্গ	■	■
দা	স	খ	ত	■	ব	ক	না
■	হ	■	■	■	■	নী	■
■	জি	■	■	■	■	নি	■
আ	য়া	ন	■	সা	হু	কা	র
■	■	রে	■	র	■	■	ট
■	দা	শ	র	থি	■	■	ন্তী

সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭২০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

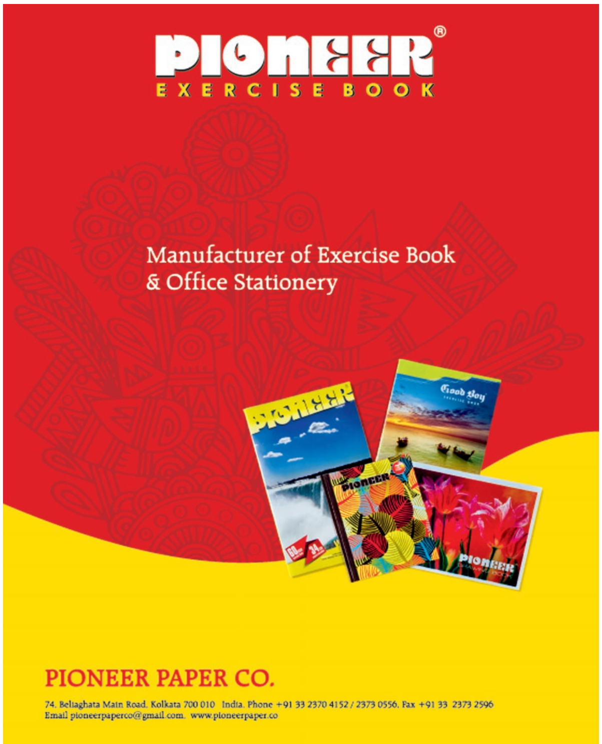

নেত্রদান মহাদান

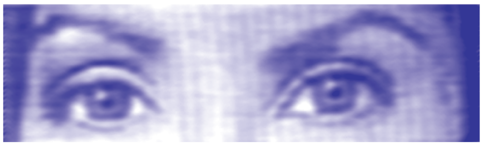

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

পাঠ্য পুস্তক প্রসঙ্গ

সাজেশন্ — নবম-দ্বাদশ

সুপার নোটস্ বেস্ট সাজেশন, S. Roy সম্পাদিত UTTARAN PROKASHANI প্রকাশিত লেটার মার্ক এ+ বই।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত বহু শিক্ষক/ শিক্ষিকার প্রশংসাপ্রাপ্ত ৮০% থেকে ১০০% কমন দিতে সিদ্ধহস্ত একমাত্র সাজেশন্ বই লেটারমার্ক এ+ পড়ুন ও নিশ্চিন্তে পাশ করুন। প্রতি বই-এর মূল্য ৫০ টাকা।

গণিত

লোয়ার শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ঋক প্রকাশনীর সোনালী গণিত সম্পূর্ণ কালার অত্যাধুনিক গণিত বই। মূল্য ৬০ টাকা।

শিশু রচনা

রচনা বই :- দ্বিতীয় শ্রেণী হতে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য। এই শ্রেণীর শিশুদের সমস্ত প্রকার পরীক্ষার জন্য শুধু একটি রচনা বই নয়, রচনার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ আমাদের লক্ষ্য। আমরাই প্রথম জন্মজাত দেশভক্ত ডাক্তারজীকে শিশু রচনা বই-এ অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রাপ্তিস্থান

এজেন্সীর জন্য বা ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন ঃ চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ৮/সি, ট্যামার লেন কলকাতা-৯। মোঃ- 9832043515 / 9635754004

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

জাতীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধন পরম্পরার অনুবর্তন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২১

উপন্যাস

■ শেখর সেনগুপ্ত ■ সুমিত্রা ঘোষ

প্রবন্ধ

স্বামী অরুণানন্দ, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, দেবীপ্রসাদ রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন সেন, তাপস অধিকারী, তথাগত রায়, সবুজকলি সেন, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, গোপালকৃষ্ণ রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র দাশগুপ্ত, জিষ্ণু বসু, চণ্ডী লাহিড়ী প্রমুখ।

এছাড়াও অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ।

সবমিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো
একটি সংরক্ষণযোগ্য পূজা সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৭০ টাকা।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
25 August - 2014

युवा भारत का कौशल विकास, छत्तीसगढ़ का बुलंद आगाज़

कौशल विकास का कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य : छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल...

- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ाने वाला पहला राज्य.
- वृहद स्तर पर युवाओं के हुनर को निखारने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू.
- प्रत्येक जिले में आवासीय लाइवलीहुड कॉलेजों की स्थापना, रोजगारोन्मुखी अल्पअवधि पाठ्यक्रम संचालित.
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 56 संकायों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण.
- अब तक 1 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित.
- 1500 से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा 2 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण.
- प्रशिक्षण प्राप्त हजारों युवाओं को देश के कई महानगरों में रोजगार.

सबके साथ
सबका विकास